মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(মর্ম্মর মূর্ত্তি)

হরপ্রসাদ জীবনী

শ্রীগণপতি সরকার

বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ এম্-আর্-এ-এস্

প্রণীত।

১৩৪৩ সাল।

হরপ্রসাদ-স্মৃতি সমিতির পক্ষে
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্
২৪৩।১ নং অপার সার্কুলার রোড্
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

২৩ নং বষ্টিতলা রোড, কলিকাতা
নারিকেলডাঙ্গা প্রিন্টিং হাউস
হইতে
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র দ্বারা
মুদ্রিত।

নিবেদন।

এই পুস্তকখানি যে পূত চরিত্র মনীষীর জীবনচরিত, তিনি বঙ্গাকাশের অন্‌ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক। তিনি দারিদ্র্যের ক্রোড় হইতে শুধু নিজেকে স্বনামধন্য পুরুষে পরিণত করেন নাই, তিনি তাঁহার দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গমগহ্বর হইতে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় উজ্জ্বল আলোকে আনিয়াছেন। এই দেশমান্য মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌-এ, ডি লিট্‌, সি-আই-ই, মহাশয় কেবল বাঙ্গালার নয়, ভারতের নয়, পৃথিবীর পূজনীয়। এইরূপ একজন প্রধান পণ্ডিতের পবিত্র জীবনী লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হওয়ায় আমি ধন্য হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু আমা অপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে এই জীবনকাহিনী আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত, তাহা বলাই বাহুল্য। পূজ্যপাদ ৺শাস্ত্রীমহাশয়কে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম এবং তিনি আমায় আন্তরিক স্নেহ করিতেন বলিয়াই "হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতি" সম্ভবতঃ পক্ষপাতিত্ব করিয়াই এই দুঃসাধ্য কার্য্য আমার ন্যায় অযোগ্য পাত্রের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌"ও এই দুর্ব্বল স্কন্ধে পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রবল চাপ চাপাইয়াছিলেন। ভগবৎ প্রসাদাৎ এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাগ্যবলে এই উভয়বিধ কার্য্যই তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধব ও ভক্তবৃন্দের আনুকূল্যে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এখন এই সম্পর্কে একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক। না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। যদিও শাস্ত্র বলে যে, "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌", তথাপি অবস্থা বিশেষে বলিতে হয়, ইহাই নীতি। সুতরাং দৃষ্টি কটু হইলেও পরিণাম রমণীয় হইবে বোধ করিয়া কথাটি বলিতেছি।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্" ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া "হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতি" নামক শাখা সমিতি গঠন করিয়া তাহার উপর উহা নির্ম্মাণের ভার দেন। হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতি ঐ মর্ম্মর মূর্ত্তির সহিত "হরপ্রসাদ জীবনী" প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করে। উভয় কার্য্য স্মৃতি-সমিতি সমাপ্ত করিয়া পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পরিষদ্ হাসিমুখে সানন্দে উহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ সম্পর্কে আমার সহিত পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়গণের যে সকল পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা আমার নিকট ও পরিষদে রক্ষিত আছে; তাহা হইতেই সমস্ত পরিষ্কাররূপ জানা যাইবে। ঐ পত্রাদি সমুদায় মুদ্রিত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ও অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা না করিয়া পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এ সম্পর্কে যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম, নতুবা আমার অপরাধ কতদূর তাহা নির্ণয় হউক বা না হউক তাহাতে আসে যায় না, আর তাহা স্মৃতি-সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনের বিবরণে কতকটা প্রকাশ, পরিষদের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ পরম পূজনীয় স্বর্গগত পবিত্রাত্মা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি বর্ত্তমান পরিষদ্ কতটা শ্রদ্ধাবান্ তাহার মীমাংসা হইবে না!

পরম পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, ডিলিট্, সি-আই-ই মহাশয়ের পরলোকগমনে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্" ১৩৩৮ সালে ২০শে অগ্রহায়ণ এক বিশেষ অধিবেশনে শোক প্রকাশ করেন। ঐ শোকসভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার ভার অর্পণ করে। এই নির্দ্দেশ অনুসারে ১৩৩৮ সালে ১০ই মাঘ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি "হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতি" গঠন করিয়া তাহার উপর কি ভাবে স্মৃতি রক্ষা করা হইবে তাহার মন্তব্য দিবার ভার ন্যস্ত করে; আর পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,

হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গণপতি সরকার ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ইহার সভ্য মনোনীত করে। ঐ সালে ৫ই চৈত্র (ইং ১৮।৩।৩২) তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশনে নিম্নোক্ত স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হউক।

(খ) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হইবে। সেই ভাণ্ডারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা দুই তিন বৎসর অন্তর যিনি ভারতীয় ইতিহাস (Indology) সম্বন্ধে গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

(গ) যদি যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ-সকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আপাততঃ নিম্নলিখিত অর্থের প্রয়োজন—

(ক)	প্রথম প্রস্তাব অনুসারে মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণে	আনুমানিক	১৫০০৲
(খ)	দ্বিতীয় ,, ,, বৃত্তির জন্য	,,	৫০০০৲
(গ)	তৃতীয় ,, ,, গ্রন্থপ্রকাশের জন্য	,,	১০০০৲
			৭৫০০৲

তারপর ঐ সনের ২৯শে চৈত্রের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঐ "হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতির" কার্য্য পরিচালনের জন্য ডাঃ সত্যচরণ লাহা, কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, রায় ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, সার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয়গণকে ঐ স্মৃতিসমিতির অতি-রিক্ত সভ্য মনোনয়ন করিয়া পূর্ব্ব মনোনীত সভ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাকে (গণপতি সরকারকে) এই "হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতির" সম্পাদক নির্ব্বাচন করেন। সার রাজেন্দ্র এবং ডাঃ বিমলা চরণ ইহার সভ্যপদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয় স্বর্গগত হন।

এই পূর্ণাঙ্গ "হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতির" প্রথম অধিবেশন ১৩৩৯ সালে ২৭শে ভাদ্র, দ্বিতীয় অধিবেশন ২৬শে মাঘ, তৃতীয় অধিবেশন ১৩৪২ সালে ২রা ভাদ্র, চতুর্থ অধিবেশন ১৩৪৩ সালের ৭ই বৈশাখ, পঞ্চম অধিবেশন ২৯শে শ্রাবণ এবং ষষ্ঠ অধিবেশন ১৬ই অগ্রহায়ণ হয়। এ পর্য্যন্ত ৬টি অধিবেশন হইয়াছে, কার্য্য শেষ করিতে আরও একটি বা দুইটি অধিবেশনের আবশ্যক হইতে পারে।

এই স্মৃতি সমিতির সম্পাদকরূপে আমি টাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতেও কোন সাড়া পাই নাই। চেষ্টায় অতি অল্পমাত্র টাকা সংগৃহীত হয়। আমি একবার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়া পরিষদে পত্র দেই কিন্তু অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ পদত্যাগ করিতে পারি নাই। আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তির জন্য ভাস্করদিগের নিকট দাম যাচাই করিয়া জানা যায় যে ১২০০৲ টাকার কম উহা নির্ম্মাণ করিতে কেহই প্রস্তুত নহে। আর মৃন্ময় আদর্শ (clay model) করিবার পূর্ব্বেই ৫০০৲ টাকা অগ্রিম না পাইলে কেহই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চান না। ইতি মধ্যে আমার (সম্পাদকের) সহিত মদ্রদেশীয় শ্রীযুক্ত সুন্দর শর্ম্মা বি-এ নামক একজন ভাস্কর ও চিত্রকরের সঙ্গে পরিচয় হয়। এই ভাস্কর আমার অনুরোধে একরূপ পারিশ্রমিক

না লইয়াই মাত্র ৮০০৲ টাকায় ঐ মর্ম্মর মূর্ত্তি করিতে স্বীকৃত হন, আরও স্বীকৃত হন যে অগ্রিম বলিয়া কিছু লইবেন না, অধিকন্তু মৃন্ময় মূর্ত্তি পছন্দ না হইলে কিছুই দাবি করিবেন না, মূর্ত্তি পছন্দ হইলে প্রথমে ৫০০৲ টাকা দিতে হইবে, পরে বাকী ৩০০৲ টাকা দিলে চলিবে। এই সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি স্মৃতি-সমিতির তৃতীয় অধিবেশন আহ্বান করি কিন্তু কোরাম অভাবে উহা হইল না। তখন আমি পরিষদের সম্পাদক ও স্মৃতি-সমিতির দুই একজন সভ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাস্করকে মৃন্ময় মূর্ত্তি তৈয়ারী করিতে বলিয়া বিশেষভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকি। পরিষদের তাৎকালিক সহকারী সভাপতি, পরে সভাপতি স্যর যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ আমার সহিত কোন কোন দিন অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছিলেন। যাহাই হউক বিশেষ চেষ্টায় অর্থ উঠিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মৃন্ময় মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া গেল, শাস্ত্রীমহাশয়ের দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্রগণ, হীরেনবাবু ও জ্যোতিষবাবু উহা দেখিয়া পছন্দ করিলে, আমি পরিষদের সম্পাদককে সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সভ্যদিগকে লইয়া ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া পছন্দ করিবার জন্য পত্র দিই। তদুত্তরে পরিষদের তাৎকালিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাস জানান যে, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মত না লইলে এবং পরিষদে যখন অর্থ নাই, তখন অর্থের কি পরিমাণ সংগ্রহ হইয়াছে না জানিলে তিনি উহা দেখিতে পারেন না। তদুত্তরে তাহাকে জানান হয় যে, টাকার জন্য পরিষদের চিন্তা নাই। টাকা একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে, সামান্য কিছু বাকী আছে তাহাও উঠিয়া যাইবে। ইহা সত্ত্বেও ৩।৫।৪২ তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মন্তব্য গ্রহণ করিলেন যে:—"স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু পরিষদের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সময়

তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ একখানি মূল্যবান উৎকৃষ্ট বৃহদায়তন তৈলচিত্র থাকিতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বোধ করেন না। তবে যদি কেহ ব্যক্তিগত ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের এক মর্ম্মর মূর্ত্তি পরিষদকে দান করেন, পরিষৎ তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতিভবন নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে উক্ত গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আশানুরূপ অর্থসংগ্রহ হইবে না বলিয়া এই সমিতি আশঙ্কা করেন।" ইহাতে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদকরূপে-আমি অপমানিত বোধ করিয়া পরিষদের সভাপতি স্যর যদুনাথ সরকারকে সমুদায় ঘটনা বিবৃত করিয়া জানাই এবং সম্পাদক সুকুমার বাবুকে এক কড়াপত্র প্রদান করি, আর পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ প্রমুখ দুই সহকারী সভাপতিকে পরিষৎ কর্ত্তৃক শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি অসম্মানজনক অসঙ্গত মন্তব্য গ্রহণের কথা বলি। আরও জানাই যে, তৈলচিত্র পরিষদ্ মন্দিরে পড়িয়া থাকা কালীন মর্ম্মর মূর্ত্তির জন্য টাকা সংগৃহীত হইতেছিল এবং ভাস্করকে মূর্ত্তি তৈয়ারী করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাও পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের অগোচর হয় নাই, পরামর্শ মতই হইয়াছে, এখন এরূপ অসঙ্গত কথা বলা পরিষদের শোভা পায় না। যাহা হউক সভাপতি যদুবাবুও আমাকে পত্র দেন এবং পরিষদে মিটমাটের জন্য পত্র লিখেন। তখন পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাহাদের পূর্ব্ব মন্তব্য বাতিল করিয়া ৬।৬।৪২ তারিখে এই মন্তব্য গ্রহণ করেন যে :—"মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে গত অধিবেশনের গৃহীত মন্তব্যের পুনরালোচনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং হরপ্রসাদ-স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয়ের পত্রের আলোচনার পর স্থির হইল যে, যদি এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্পর্কে পরিষদের কোনরূপ আর্থিক দায়িত্ব না থাকে, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের মর্ম্মর

মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হউক এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় এই উদ্দেশ্যে পরিষদের নামে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন।" কিন্তু এত সত্ত্বেও পরিষদের কেহই মূর্ত্তি দেখিতে আসিলেন না। মূর্ত্তি তৈয়ারী হইয়া পরিষদে আসিল, তখন সকলে দেখিয়া খুসি হইলেন। প্রথমে স্মৃতিসমিতি তাহার দ্বিতীয় অধিবেশনে পুনরায় চতুর্থ অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী লিখিবার ভার আমার (গণপতিবাবুর) উপর দেন। পুস্তক লিখিত হইলে, পরিষদের সম্পাদক পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় (ইতি মধ্যে সুকুমার বাবু পদত্যাগ করায় অমূল্য বাবু সম্পাদক হইয়াছেন) ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিলেন, এবং উহার একটি করিয়া প্রুফ দেখিয়া দিবেন স্বীকার করিলেন, উহা ছাপিতে দেওয়া হইল। পুস্তকের প্রুফ রীতিমত পরিষদে পাঠান হইয়াছে। তারপর স্মৃতি-সমিতি পঞ্চম অধিবেশনে উহা পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত পরিষৎ করিবেন কি না জানিবার জন্য মন্তব্য গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে জানাইলে, পরিষৎ ৯ই ভাদ্রের পত্রে তাহাদের গৃহীত মন্তব্য পাঠাইলেন, তাহা এই :—
"হরপ্রসাদ স্মৃতি সমিতির গত ২৯শে শ্রাবণ ১৩৪৩ তাং কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল। স্থির হইল যে—(ক) স্মৃতি সমিতির কার্য্যবিবরণে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় রচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন চরিত "স্মৃতি সমিতির অর্থে মুদ্রিত হইতেছে"—এই অনুমতি কে দিয়াছেন, তাহা জানাইবার জন্য উক্ত স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি বাবুকে অনুরোধ করা হউক। (খ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত উক্ত জীবনী পরিষদ্ গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইবে কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেই পারে না।" স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক হওয়ায় পরিষৎ আমার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন দেখিয়া আমি উহার কৈফিয়ৎ দিয়া জানাই যে, যেখানে কোনরূপ আর্থিক দায়িত্ব পরিষদ্ লইতে নারাজ, সেখানে শাস্ত্রীমহাশয়ের স্মৃতি সম্পর্কে স্মৃতি-সমিতির প্রত্যেক

কার্য্যে এরূপভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বাধা দিবার কারণ কি? তাহারা কি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি চান না বা এই স্মৃতি-সমিতিকে চান না। যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি না চান, জানান, স্মৃতি-সমিতি যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণের পর পরিষদে আনিয়া রাখিয়াছে তাহা লইয়া যাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের মূর্ত্তিস্থাপনের উপযুক্ত স্থানে কলিকাতার মধ্যে উহা স্থাপন করিবেন। ইহার পর স্মৃতি সমিতিকে পরিষৎ কিছুই জানান নাই, তবে পরস্পর শুনা যাইতেছে যে সভাপতি মহাশয় মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতা করিবেন।

মর্ম্মরমূর্ত্তি ও জীবনীর জন্য অর্থ-প্রদাতাগণের নাম

স্যর	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়	...	...	১০০৲
	শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত	...	...	১০০৲
ডাক্তার	শ্রীসত্যচরণ লাহা	...	...	১৫০৲
,,	শ্রীনরেন্দ্র নাথ লাহা	...	...	১০০৲
,,	শ্রীবিমলাচরণ লাহা	...	...	১০০৲
	শ্রীগণপতি সরকার	...	...	১০০৲
বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর	শ্রীবিজয় চাঁদ মহাতাব	...	...	১৫০৲
	শ্রীরাজশেখর বসু	...	...	৫০৲
	শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য্য	...	...	৫০৲
	শ্রীপরিতোষ ভট্টাচার্য্য	...	...	২৫৲
	শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য	...	...	২৫৲
	শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ	...	...	২৫৲
স্যর	শ্রীযদুনাথ সরকার	...	...	২৫৲
মহামহোপাধ্যায়	শ্রীআদিত্য নাথ মুখোপাধ্যায়		...	১০৲
প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব	শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু		...	১০৲
	শ্রীসোম নাথ সিংহ	...	...	১০৲

সার জর্জ এ গিয়ারসন	...	...	১৩।০
পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ	...	...	৫৲
শ্রীঅনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়	...	...	৫৲
এক কালীন দান	...	...	১৲
			১০৬৪।০

হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির পক্ষে সম্পাদক রূপে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি আর্থিক সাহায্য প্রদাতাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক রচনায় ঘটনাদি সম্পর্কে কিছু উপকরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল, তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ এবং প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ দিয়াছেন। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড"; "Historical Quarterly, (Haraprosad Memorial Volume)" এবং "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখামালার"ও সাহায্য লইয়াছি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কাব্যতীর্থ ন্যায়সাহিত্যাচার্য্য প্রুফ দেখায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মূর্ত্তি ও পুস্তক সম্পর্কে পরামর্শাদি দিয়া ও হরপ্রসাদ-স্মৃতি-সমিতির অর্থ সংগ্রহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন। বসুমতীর সত্ত্বাধিকারী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চারিখানি ব্লক এবং পরিষদের সম্পাদক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের তিনখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

মুদ্রাকর প্রমাদ তো আছেই, তদুপরি তাড়াতাড়ি পুস্তকটি বাহির করিবার চেষ্টা করায় কয়েকটি বানানে ভুল ভ্রান্তি হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধিপত্রও দেওয়া হইল। বিদ্বদ্জনের নিকট ত্রুটির মার্জ্জনা আছে, ইহাই ভরসা। ইতি

শ্রীগণপতি সরকার

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১২	জ্ঞাতীরা	জ্ঞাতিরা
২	১২	তর্কলঙ্কার	তর্কালঙ্কার
৩	২১	ন্যায়চঞ্চু	ন্যায়চুঞ্চু
৪	১১	কৃতি	কৃতী
৫	৩	রাজযক্ষা	রাজযক্ষ্মা
৭	১৪	অমাবশ্যার	অমাবস্যার
৮	৩	সপিণ্ডকরণের	সপিণ্ডীকরণের
৮	৪	রাজযক্ষায়	রাজযক্ষ্মায়
১৩	১২ + ১৩	কৃতি	কৃতী
১৩	২৪	ভাগ্য	ভাগ্যে
১৪	২	স্মরণাপন্নই	শরণাপন্নই
১৫	২৫	অযশ্রধারায়	অজস্রধারায়
১৬	২	কৃতি	কৃতী
২২	১৭	পুরতত্ত্ব	পুরাতত্ত্ব
২৪	১২	লইতে	হইবে
২৯	১৪	আশোক	অশোক
৩৮	১৩	ছিলেন	ছিলেন।
৪৬	১৯	greant	grant
৫১	৮	কৃতি	কৃতী
৫৫	২০	কালিদা	কালিদাস
৬১	১৮	বাঙ্গলা	বাঙ্গালা
৭৭	২০	আমায়	আমার
৮৩	৪	১০৮শ্রীশ্রীস	শ্রী১০৮শ্রী
৯১	১৫	চতুবর্গ	চতুর্বর্গ
৯৭	২৪	উদ্বত	উদ্ধৃত

হরপ্রসাদ জীবনী

বংশ-পরিচয়

বন্দ্যঘটী বংশে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে দুর্ব্বলী নামে এক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাপণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার অধস্তন দশম পুরুষ রাজেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার যশোহর জেলার নলডাঙ্গার রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। সে কালের তাহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনন্দন ও বিদ্যানিবাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার চতুর্থ পুরুষে মাণিক্য তর্কভূষণ নামে এক পণ্ডিত জন্মান। যশোহর জেলার কুমিরা নামক গণ্ডগ্রাম, যাহা এখন খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাঁহার জন্মভূমি। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হইতে ১২ দ্বাদশ ক্রোশ উত্তরে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে উপস্থিত হন এবং গঙ্গাতীর বলিয়া ঐ স্থানেই বাস করেন। যশোহরে কালীগঞ্জের নিকট তাঁহার জ্ঞাতীরা আজও বসবাস করিতেছেন।

মাণিক্য তর্কভূষণ সাধারণের নিকট মাণিক তর্কভূষণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি (সুপ্রিম কোর্টের জজ) সার উইলিয়ম্ জোন্স স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কে তর্কভূষণের মতই মান্য করিতেন। খড়দার গোস্বামীদিগের সম্পত্তি বিভাগের মকর্দ্দমা (পার্টিসন্ সুট্) হয়।

এক পক্ষে মাণিক তর্কভূষণ অপরপক্ষে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন। বিচারপতি মাণিক পণ্ডিতের মতই গ্রহণ করেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে চাকরি লইতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি ম্লেচ্ছের চাকরি করিবেন না বলিয়া ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঐ চাকরি গ্রহণ করেন। ইহাই ইংরাজ-রাজের অধীনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রথম চাকরি স্বীকার।

মাণিক্য তর্কভূষণের পাঁচ পুত্র। তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সদাশিব ও শ্রীনাথ এই দুইজনই প্রসিদ্ধ। সদাশিব শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের সভাপণ্ডিত এবং একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। শোনা যায় যে, তিনি যখন গঙ্গা-স্নান করিয়া বাড়ী আসিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া পা ধুইতেন, তখন ঐ পাদোদক লইবার জন্য রীতিমত ভিড় জমিয়া যাইত।

শ্রীনাথ তর্কলঙ্কার একজন নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার নামে তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক (সেক্রেটারি) হইয়াছিলেন। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া মুর্শিদাবাদে সেখানকার ন্যায়ের ফাঁকি শিখিতে যান। তাহাতে শ্রীনাথ তাঁহার পিতার নিকট লাঞ্ছিত হন। কি জন্য তাঁহারা মুর্শিদাবাদে পড়িতে গিয়াছিলেন তাহার উত্তরে শ্রীনাথ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নৈহাটির ফাঁকি শিখিয়াছেন কিন্তু মুর্শিদাবাদের ফাঁকি জানেন না বলিয়াই তাহা শিখিতে গিয়াছিলেন। শ্রীনাথ ২৭।২৮ বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর ঘটনা বড়ই শোকাবহ। বর্দ্ধমানের এক সভায় তিনি এবং তাঁহার পিতা মাণিক তর্কভূষণ গিয়াছিলেন। সেখানে নবদ্বীপ প্রভৃতি বাঙ্গালার সকল দেশের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সমাবেশ হইয়াছিল। শোনা যায়, তখন ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার কোনই প্রভাব হয় নাই; এবং এখন যে ভাটপাড়ার খ্যাতি তাহা মাণিক পণ্ডিতের শিষ্যবর্গ হইতে। সেই সভায় শ্রীনাথের নিকট নবদ্বীপ প্রভৃতি বাঙ্গালার

সকল পণ্ডিতই পরাজিত হন; কিন্তু দৈবের ব্যাপার, সেখানে পিতাপুত্রে বিচার হয়, তাহাতে পিতা পরাভূত হইয়া পুত্রকে অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহাকে যেন আর ঐ পুত্রের মুখ না দেখিতে হয়। "পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্" এ কথার প্রসিদ্ধি থাকিলেও, প্রাণে বোধ হয় লাগে, অহঙ্কারে আঘাত পড়ে, নতুবা পিতা পুত্রকে অভিসম্পাত করিবেন কেন। শ্রীনাথ বিদায় লইয়া পিতার অগ্রেই রওনা হন এবং পথের মধ্যে ডাকাতের হাতে পড়েন। তাহারা তাঁহার সমস্ত লুটিয়া লয় এবং তাঁহাকে কাটিয়া ফেলে। মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীনাথ লিখিয়া যান যে, পিতার অভিশাপ ফলিল, তাঁহার মুখ আর তাঁহার পিতাকে দেখিতে হইবে না। সেই পথই ফিরিবার পথ থাকায়, মাণিক তর্কালঙ্কার পথে পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া ও ঐ লেখা পাইয়া অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন এবং বাড়ী ফিরিবার পর আর অধিক দিন বাঁচেন নাই।

শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের পুত্র রামকমল ন্যায়রত্ন। সদাশিব ও রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার তাঁহাকে মানুষ করেন। রামমাণিক্য বন্ধুর পুত্র বলিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজে টোল করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শুধু নিজের টোলে নহে, তাঁহার পিতার এবং পিতামহের একসঙ্গে তিনটি টোলে পড়াইতে হইত। রামকমলের মৃত্যুকালে ছয়পুত্র ও এক কন্যা জীবিত ছিলেন।

রামকমল

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু	জগৎমোহিনী	রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	হেমনাথ ভট্টাচার্য্য	শরৎনাথ (হরপ্রসাদ) শাস্ত্রী	মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। তিনি যে কিরূপ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় লিখিয়া

গিয়াছেন। এই রমাপ্রসাদই হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী জজ কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ঐ পদপ্রাপ্তির সময় তিনি পীড়িত ছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়; সুতরাং ঐ পদে তিনি বসিতে পারেন নাই। রায় মহাশয় ন্যায়রত্ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Nearly half the real Sanskrit celebieties of the land are disciples of this family and no congregation of Pandits is said to be complete without the presence of his (Nanda Kumar Nayachunchu) father."

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্রদিগের মধ্যে টোলের পণ্ডিত হিসাবে নন্দকুমার এবং কলেজের পণ্ডিত হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই সুবিখ্যাত। অন্য পুত্রেরা কেহ পণ্ডিত হন নাই বটে কিন্তু প্রত্যেকেই কৃতি ছিলেন।

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে অনেক পণ্ডিতই ফুটিয়া উঠিতে পারিতেন না। হয়তো শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যোতিও ম্লান হইত। তিনি রমাপ্রসাদ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধেই কাঁদির সরকারী ইংরাজী স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের ঋষি আদি ঔপন্যাসিক সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহাদের বিবাহ সম্পর্কে একটু রহস্য আছে। তখন ভাটপাড়ার এবং হুগলীর ইল্‌ছোবার দুইটি কন্যার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ছিল। ইল্‌ছোবার কন্যার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের এবং ভাটপাড়ার কন্যার সহিত নন্দকুমারের বিবাহের প্রস্তাব উঠে। শেষে বিবাহটি অদলবদল হইয়া যায়; অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু ভাটপাড়ার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নন্দকুমারের সহিত ইল্‌ছোবার বিরাজমোহিনী দেবীর বিবাহ হয়। ইনি বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু পতিভাগ্য ভাল ছিল না। বিবাহের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই অপুত্রক অবস্থাতেই ইঁহার বৈধব্য ঘটে। ইঁহার বৈধব্য শ্বশুর-বংশের

উপকারের জন্যই বোধ হয় ঘটিয়াছিল, কেন না ইনি দেবরগণের মাতৃস্বরূপা হইয়াই তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নন্দকুমার পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পরেই রাজযক্ষ্মায় কালগ্রাসে পতিত হন।

নন্দকুমারের দ্বিতীয় ভ্রাতা রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখক ছিলেন; পরে টিহারীর গাড়োয়াল ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রী হন। তৃতীয় ভ্রাতা যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ডেরাডুনের চা বাগানের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। চতুর্থ ভ্রাতা হেমনাথ ভট্টাচার্য্য নন্দকুমারের পর অল্প বয়সেই মারা যান। পঞ্চম ভ্রাতা শরৎ নাথই আমাদের হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যাঁহার জীবন-কথাই এই পুস্তকের অবলম্বন। ষষ্ঠ ভ্রাতা মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য রাজপুতনায় জয়পুরের মহারাজ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপল ছিলেন।

রামকমল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম পুত্র শরৎচন্দ্রই দীর্ঘজীবন লাভ করেন এবং উত্তরকালে অশেষ খ্যাতি সম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ; ডি লিট্; এফ্ এ এস্ বি; এফ্ আর্ এ এস্; সি আই ই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মপত্রী পাই নাই কিন্তু তাঁহার নিকট জানিয়াছিলাম যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবার ২২শে অগ্রহায়ণ ষষ্ঠী তিথি ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে নৈহাটীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি লগনচাঁদা ছিলেন। ইহা হইতে তাঁহার জন্মকুণ্ডলী তৈয়ারী করা আদৌ দুঃসাধ্য হয় নাই। কেবল প্রকৃত দণ্ড পলাদি স্থির করাতে কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে বটে কিন্তু জন্মকুণ্ডলী নির্ম্মান সহজেই হইয়াছে। তাঁহার জন্মকুণ্ডলী নির্ম্মাণের উপাদান এইরূপ ;—

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে পঞ্জিকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

শকাব্দা ১৭৭৫, সন ১২৬০, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ। ২২শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর। মঙ্গলবার। ষষ্ঠী ১৬।৩ পল পর্য্যন্ত। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ২৬।১৮

পল পর্য্যন্ত। ব্যাঘাত যোগ ২৬।১৮ পলের পর হর্ষণ যোগ ৫৭ দণ্ড পর্য্যন্ত; সুতরাং পাওয়া গেল যে চন্দ্র কুম্ভ রাশিতে। লগন চাঁদা জানা থাকায় চন্দ্রযুক্ত রাশিতে লগ্ন ইহাই বুঝিতে হইবে, সুতরাং কুম্ভ লগ্নে জন্ম। ঐ দিন কুম্ভ লগ্নের পরিমাণ ১৫ দণ্ড ৩৫ পল পর্য্যন্ত। আবার ষষ্ঠীতে জন্ম জানা আছে, সেই ষষ্ঠী তিথির ঐ দিন স্থিতিকাল ১৬।৩ পল পর্য্যন্ত। অতএব জন্মদণ্ড ১১ দণ্ড ৩৮ পল হইতে ১৫ দণ্ড ৩৫ পল মধ্যে। ইহা আরও সূক্ষ্ম করা চলে কিন্তু এক্ষেত্রে সে আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এখন জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহ সমাবেশ কিরূপ ছিল তাহাই লিখিতেছি,—

১৭৭৫।৭।২১।১১ দণ্ড ৩৮ পল হইতে ১৫ দণ্ড ৩৫ পল মধ্যে জাতদণ্ডাদি।

এই কুণ্ডলীতে চন্দ্রলগ্নে, বৃহস্পতি একাদশে, দশমে রবি বুধ ও কেতু, শনি ও শুক্রে বিনিময়, রবি ও মঙ্গলে বিনিময় ঘটিয়াছে। ইহাতেই নাম যশ

বিদ্যা ও সৌভাগ্য দিয়াছে। সপ্তমে মঙ্গল, সপ্তমপতি রবি ও ৮মপতি বুধ একত্র থাকিয়া পাপ কেতু যুক্ত হইয়া পাপ শনি ও রাহু কর্ত্তৃক দৃষ্ট, আর রবি ও মঙ্গলের বিনিময় ঘটায় পত্নীহানি করিয়াছে।

বাল্যশিক্ষা :—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় নৈহাটিতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে একটি ইংরাজী স্কুল শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানার পাশে চণ্ডীমণ্ডপে প্রথম খোলা হয়। পরে ঐ বিদ্যালয় নারায়ণ বাবুর বাড়ীতে উঠিয়া যায়। এই বিদ্যালয়েই হরপ্রসাদ প্রথম শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষক মহাশয় একদিন তাহাকে নিল্‌ডাউন্ (হাটুগেড়ে বসা) করিয়া দিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া পুত্রকে ঐ বিদ্যালয়ে আর যাইতে দেন নাই। কারতারক কোম্পানীর সুপ্রসিদ্ধ তারক সরকার মহাশয় ১০০০৲ টাকা দিয়া ঐ স্কুলের বাড়ী ও "হল্" তৈয়ারী করিয়া দিলে স্কুল সেখানে হইল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রথের পর অমাবস্যার দিন হরপ্রসাদ পুনর্ব্বার ঐ স্কুলে পড়িতে যান। ঐ দিন ৫৯ বৎসর বয়সে তাহার পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গঙ্গা লাভ হয়। সে সময় হরপ্রসাদ ৪র্থ কি ৫ম শ্রেণীতে পড়িতেন।

পিতার মৃত্যুকালে নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কাঁদি স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। পিতার শ্রাদ্ধের পর তিনি ভ্রাতা হরপ্রসাদকে কাঁদিতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই স্কুলের ভর্ত্তির খাতায় হরপ্রসাদ নাম পাওয়া যায় না, কারণ তখন আমাদের হরপ্রসাদের শরৎ নাম ছিল। একটি কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তিনি মরণাপন্ন হইলে, হরের নিকট মানসা করিবার পর, ঐ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। তখন তাহার শরৎ নামের পরিবর্ত্তে হরপ্রসাদ নাম

রাখা হয়। এই নামের পরিবর্ত্তন কাঁদিতে হয় কি নৈহাটিতে হয় তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু সংস্কৃত কলেজে তিনি হরপ্রসাদ। এই কাঁদিতে ছয় সাত মাস পড়েন। তাহার পর তাঁহারা পিতার সপিণ্ডকরণের সময় নৈহাটি ফিরিয়া আসিবার পর, অল্পদিনের মধ্যেই নন্দকুমার রাজযক্ষ্মায় মারা যান; তাহাতেই হরপ্রসাদের কাঁদির পাঠ শেষ হয়। এই সময় তাহার অন্য ভ্রাতারা হুগলি কলেজে পড়িতে যান।

নৈহাটির এই শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য বংশ সরস্বতী দেবীর কৃপা লাভ করিয়া বিদ্যায় বিখ্যাত হইলেও মা লক্ষ্মীর কৃপা-কটাক্ষে বঞ্চিত ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতের সংসার যেরূপ চলিত, সেইরূপ তাঁহাদের সচ্ছলে চলিয়া যাইত বটে কিন্তু ন্যায়রত্ন ও ন্যায়চুঞ্চু মহাশয়দিগের মৃত্যুতে, অভিভাবকের অভাবে, এই সংসারের আর্থিক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তারক সরকার মহাশয়ের বদান্যতায় এ বিপদ কাটিয়া যায়। অবশ্য সরকার মহাশয়দিগের সহিত ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগের সৌহার্দ্দ পূর্ব্বাপরই ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, এই সরকার পরিবারের সহিত তাঁহাদের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে যে টুকু প্রভেদ না থাকিলে নয় তাহা ব্যতীত আর কোন প্রকার বিভেদ ছিল না। পরে যদুনাথ উপায়ক্ষম হইয়া সংসারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

হরপ্রসাদ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে উঠিবার পর ভাটপাড়ার টোলে পড়িতে যান, কিন্তু সেখানে তাহার বেশীদিন পড়া হইল না; তাহার জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আবার তিনি স্কুলে পড়েন এবং পরীক্ষায় নবমস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া চারিটা স্কলারসিপ্ পান। তখন স্কলারসিপ্ চার বৎসরের জন্য দেওয়া হইত এবং বিনা মাহিনায় (Free) পড়িতে পারা যাইত। তাহাই সম্বল করিয়া হরপ্রসাদ কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়িতে আসেন। কলিকাতায় তাহার পরিচিত কেহ না থাকায়, তাহাকে তিন দিন একরূপ অনাহারেই থাকিতে হয়, থাকিবার স্থানও পান নাই;

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ী যান। এখানে তিনি চার পাঁচ মাস থাকেন। এই সময় কোন কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ছাত্রাবাস তুলিয়া দেন। তখন হরপ্রসাদ বহুবাজার নেবুতলায় এক স্বর্ণবণিক-দিগের ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বাসা পান। এখানে তাহার পুত্রকে পড়াইতেন, তাহার পরিবর্তে ঘরভাড়া লাগিত না। এবং নিজে রাঁধিয়া খাইতেন; এমনও হইত একদিন রাঁধিতেন, তাহা দুই তিন দিন খাইতেন। যাহা হউক বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে থাকিবার সময়/তিনি সংস্কৃত কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহার সমগ্র "রঘুবংশ" মুখস্থ হইয়া যায়। এই শ্রেণীতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন "রঘুবংশ" পড়াইতেন। এই রামনারায়ণই সুপ্রসিদ্ধ নাটুকে রামনারাণ। তাহার নিকটেই হরপ্রসাদ কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার জ্ঞানলাভ করেন। এই শ্রেণী হইতেই এক শ্রেণী টপকাইয়া (ডবল প্রোমোসন লইয়া) ৪র্থ শ্রেণীতে উঠেন। এখানে "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ পড়েন। এই শ্রেণীতে ৩০ ত্রিশ জনের অধিক ছাত্র থাকিত না। এই শ্রেণীতে পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। আবার এখান হইতে ডিঙ্গাইয়া (পুনর্ব্বার ডবল প্রোমোসন লইয়া) ২য় শ্রেণীতে উঠেন।/১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা (এনট্রান্স) পরীক্ষায় ১১শ একাদশ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৪৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন এবং সংস্কৃত কলেজের বৃত্তি ৮৲ টাকা পাইয়াছিলেন। এফ্-এ পরীক্ষায় ষষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন কিন্তু বৃত্তি পান নাই। সংস্কৃত কলেজ হইতে এম্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া ৫০৲ টাকার এবং ২৫৲ টাকার দুইটি বৃত্তি, আরও ২৫০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার পান। প্রসিদ্ধ রমানাথ সরস্বতী তাহার সহপাঠী ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এম্-এ পাশ করেন, ইহাই আমাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কুমার ডাঃ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্‌-এ, বি-এল্‌, পি-আর্‌-এস্‌, পি এইচ ডি তাঁহার The Indian Historical Quarterly Vol. IX 1933 Haraprosad Memorial Number সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, হরপ্রসাদ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এম-এ পাশ করিয়াছিলেন; ইহা ছাপার ভুল কি নরেন বাবুর সংবাদ প্রাপ্তির ভুল জানি না। সংস্কৃত কলেজ হইতে হরপ্রসাদ সংস্কৃতে এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন কিন্তু ঐ উপাধির মানপত্র (সার্টিফিকেট্‌) ক্যানিং কলেজের কাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পাইয়াছিলেন। মানপত্র ছাপা না থাকায় এবং ছাপিতে বিলম্ব ঘটায় এইরূপ হয়। তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার আজকালকার মত ছিল না। সেকালে মানপত্র একবার ছাপা হইলে যতদিন না তাহা নিঃশেষ হয় ততদিন আর ছাপা হইত না। তখন ছাপাখানারও এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। ঐ শাস্ত্রী উপাধির মানপত্র খানি সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ (প্রিন্‌সিপল্‌) মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন স্বহস্তে তাহাকে দিয়াছিলেন। 'শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন — My school career is brilliant than my college career.' কথাটা খুব সত্য; কারণ স্কুল-জীবনে প্রত্যেকবার বৃত্তি পাইয়াছেন এবং দুইবার উল্লম্ফন (ডবল প্রোমোসন) করিয়াও কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লইয়াছেন। আর কলেজ-জীবনে একবার বৃত্তি পান নাই। অবশ্য এম্‌-এ পরীক্ষায় তাহার এ ক্ষোভ নিবৃত্তি হইয়াছিল।

সংস্কৃত কলেজে পড়িবার সময় ঐ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা লিখিবার প্রণালী বা রীতি শিক্ষা করেন। যে শিক্ষার ফলে তাহার লিখিবার প্রণালী ও ভঙ্গী সত্যই সুন্দর হইয়াছিল। হরপ্রসাদের বাঙ্গালা লেখার মত সংস্কৃত বিরল অথচ খাঁটী বাঙ্গালা লেখা দেখা যায় না।

হরপ্রসাদের কালে যে সকল ছাত্র বৃত্তি পাইত, তাহাদিগের পড়িবার বড় সুবিধা ছিল। তাহারা স্কুল বা কলেজে যে বৃত্তি পাইত, তাহা ত পাইতই, অধিকন্তু বিনা বেতনে পড়িতে পারিত। এই বৃত্তির টাকা হইতেই এম্-এ পাশ করিবার পর হরপ্রসাদ দেখিয়াছিলেন যে, তাহার ১০০০৲ এক হাজার টাকা জমিয়াছে।

গার্হস্থ্য জীবন—

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ হরপ্রসাদের বিবাহ হয়। এই দিনই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রথম কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের রাজার বিবাহ হয়। হরপ্রসাদ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকট দেয়াসিন গ্রামের রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সাব্ জজ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবীকে বিবাহ করেন।

রায় বাহাদুর সুদীর্ঘজীবি ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না। কেবল পাঁচ কন্যা। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দুহিতা, দৌহিত্র, জামাতা প্রভৃতি ধরিয়া বংশলতায় ৩৬০ জন জীবিত ছিলেন দেখা গিয়াছিল। তাহারা সকলে বৃদ্ধ রায় বাহাদুরকে এক অভিনন্দন দিয়াছিলেন। তাঁহার আর একজন জামাতা কলিকাতার প্রসিদ্ধ এড্ভোকেট্ শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রমথ বাবুরও শ্বশুরের ন্যায় কেবল কন্যারত্নই হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর প্রায় তিন বৎসর পরে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বৎসর বয়সে রায় বাহাদুর পরলোক গমন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে বাসন্তী সপ্তমীর পর অন্নপূর্ণা পূজার দিন হরপ্রসাদের মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি পিতার স্বর্গলাভের ১৪ বৎসর পরে ১৮৭৫ বা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্কলারসিপের টাকা হইতে জননীর দুইটি ব্রত ১০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া উদ্‌যাপন করাইয়া দেন এবং আর ১০০৲ টাকা খরচ করিয়া বাড়ীর সন্নিকটস্থ একটি বারবনিতাকে

তুলিয়া দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ভট্টাচার্য্যবংশ ধনী ছিলেন না; পণ্ডিতের বৃত্তিতেই জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং এই অবস্থায় হরপ্রসাদের পক্ষে ২০০৲ টাকা ব্যয় করা কম নহে। প্রকৃতপক্ষে এই বংশে একমাত্র আমাদের হরপ্রসাদই লক্ষ্মী সরস্বতীর যুগপৎ কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিবাহিত জীবন ত্রিশ বৎসর যাপন করেন। যে সময় তিনি সংস্কৃতকলেজের প্রিন্‌সিপল্ এবং সরকারের অনুরোধে অক্সফোর্ডের সংস্কৃত অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেবের সঙ্গে পুরীতে ছিলেন, সেই সময় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। স্ত্রীর মৃত্যুকালে যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই এ দুঃখ তাঁহার চিরকাল ছিল। ইহার পরই তিনি নভেম্বর মাসে চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া যান। স্ত্রীর জীবিত কালে দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমার সহিত কুমিরার শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ভুবন বাবু বিহার-উড়িষ্যা-বিভাগের ডিস্‌ট্রিক্ট-জজ হইয়াছিলেন। ভুবনবাবুরও কন্যা ব্যতীত পুত্র হয় নাই। দ্বিতীয় কন্যা সুরবালার সহিত রাণাঘাটের মাঝের গাঁর ৺ শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। তিনি যশোহরের সাব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন। কন্যা দুইটি ভ্রাতাদিগের অগ্রজা। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষ ভট্টাচার্য্য সিংভূম জেলার মৌভাণ্ডার ঘাটশিলার তামার খনির ইন্‌জিনিয়র। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌এ, বিএল্। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পরিতোষ ভট্টাচার্য্য। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নহেন বটে কিন্তু তিনি কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিয়াছেন এবং নৈহাটী মিউনিসিপালিটির কমিশনার। পিতার আকৃতির সাদৃশ্য পরিতোষ বাবুই লাভ করিয়াছেন। চতুর্থ পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম, এ;

পি এইচ, ডি ; রাজরত্ন, জ্ঞানরত্ন বরোদা-রাজ-সরকারের প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ (Librarian)। তৎপরে কন্যা শ্রীমতী সুষমা। তাহার সহিত গয়ার জমিদার ও ব্যবসায়ী ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কালীতোষ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এস-সি, 'অডার সাপ্লাই' ব্যবসা গ্রহণ করিয়াছেন। এই শাস্ত্রীদম্পতীর আরও তিনটি যে সন্তান সন্ততি হইয়াছিল তাহারা অতি শৈশবেই ইহধাম ত্যাগ করে। স্ত্রী বিয়োগের পর শাস্ত্রী তাঁহার দীর্ঘজীবনে পুত্র কন্যার জন্য শোক পান নাই। কেবল তাঁহার মৃত্যুর বোধ হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয় জামাতার শোক পাইয়াছিলেন। তিনি শোক প্রকাশ করিতেন না বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার মৃত্যুকে নিকটস্থ করিয়াছিল। তিনি সৌভাগ্যবান্ পুরুষ, সকল পুত্র কন্যাদিগকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে পিতার পুণ্যবল থাকিলে পুত্র বিদ্বান্ ও কৃতি হয়। তাঁহার জীবনে ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। পুত্রেরা সকলেই কৃতি ও বিদ্বান্; বিনয়তোষ সংস্কৃতজ্ঞ বটে কিন্তু এই বংশের প্রাচীন পাণ্ডিত্যের গৌরব শাস্ত্রী মহাশয়েতেই পর্য্যবসিত।

হেমন্ত কুমারী দেবী কালোপযোগী সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধির সামাজিক ইতিহাসগুলি খুব মনোযোগের সহিত পড়িতেন। বলিতে গেলে শাস্ত্রী তাঁহা হইতেই ঐ পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সুগৃহিনী ছিলেন কিন্তু শরীর বেশ পটু ছিল না; এই জন্য যদিও তিনি রাঁধিতে জানিতেন কিন্তু শরীরে কুলাইত না বলিয়া রাধুনী রাখিতে হইয়াছিল। একদিন তিনি রাঁধিতে যাইয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে রাঁধিতে যাইতে দেওয়া হয় নাই।

দেখা যায় যে, যিনি যাহা ভালবাসেন তাহার ভাগ্য তাহার বিপরীতই ঘটে। শাস্ত্রীর বরাতে ইহাই ঘটিয়াছিল। তিনি বাড়ীর মেয়েদের

রাঁধা অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিতে ভালবাসিতেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রাঁধিতে পারিতেন না বলিয়া রাঁধুনীর শরণাপন্নই থাকিতে হইত। এই রাঁধা লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রসিকতাও হইত। শাস্ত্রী মহাশয় প্রসঙ্গ ছলে আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাড়ীতে একবার গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণ-যাত্রা হয়, এ যাত্রার খুব খ্যাতি ছিল, অধিকারী অতি সুন্দর গাহিতেন, তাহাতে অধিকারী রাধিকা সাজিয়া গান করেন—

"লিখিতে শিখিতে দিলে কই
জন্মাবধি নিরবধি জানি না আর তোমা বই।"

ইহার কয়েক দিন পরেই কথায় কথায় শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মণীকে যেন অনুযোগ ভরেই বলেন যে. "ভাতার পুতের পাতে যে রেঁধে ভাত দিতে পার্‌লে না, তার জীবন বৃথা।" ইহাতে শাস্ত্রী-গৃহিণী অধিকারী মহাশয়ের ভঙ্গীতে কর্ত্তার মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া উত্তর দেন—

"রাঁধিতে শিখিতে দিলে কই,
বিভাবধি (বিবাহ অবধি) নিরবধি জানিনা আর আঁতুর বই॥"

তাঁহাদের বিবাহিত ৩০ বৎসর জীবনের মধ্যে ১০।১২টি সন্তান সন্ততি হইয়াছিল।

শাস্ত্রী মহাশয় জ্ঞানী ও চাপা লোক ছিলেন বলিয়া শোক প্রকাশ বাহিরে করিতেন না, কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের সুদীর্ঘ কালপরেও দেখিয়াছি, তিনি স্ত্রীকে শুধু ভুলিতে পারেন নাই তাহা নহে, ঐ শোক তাঁহার হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় তীব্রভাবেই প্রবাহিত ছিল। তিনি ধরা দিতে না চাহিলেও ধরা পড়িয়াছিলেন। একদিন তাঁহার পটল-ডাঙ্গার বাড়ীতে তিনি ও আমি কথাবার্ত্তা বলিতেছি, প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি আমাকে বলিলেন "একদিন আমি ও তোমার দাদাশ্বশুর (হুগলির সুপ্রসিদ্ধ

সরকারী উকিল রায় ঈশান চন্দ্র মিত্র বাহাদুর) গঙ্গায় নৌকা করিয়া যাইতেছি। গঙ্গার ওপারে একস্থানে লোকের ভিড় ও ধূয়া উড়িতেছে দেখিয়া, ঈশান বাবু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, অমুকের স্ত্রী সধবা মারা গিয়াছেন, তাহার সংকার হইতেছে। তাহা শুনিয়া রায় বাহাদুর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'স্ত্রীর শোক তালগাছের মত'। তখন তাঁহারও স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। রায় বাহাদুরের কথাটা ঠিক হে, যতই দিন যায় স্ত্রীর শোক যেন ততই দীর্ঘ হয়।" এই কথা হইতেই তিনি স্ত্রীবিয়োগে কতদূর ব্যথিত তাহা প্রকাশ পায় না কি!

১৯১১ খৃষ্টাব্দে হরপ্রসাদের কনিষ্ঠ সহোদর মেঘনাথ পরলোক গমন করেন।

বিপত্নীক হইয়া তিনি একরূপ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার পুত্রেরা নৈহাটির বাড়ীতে থাকিত। কখন কখন কোন পুত্র তাঁহার নিকট কলিকাতায় পটলডাঙ্গার বাড়ীতে থাকিত। কখন কখন কেহ সস্ত্রীক থাকিত। তাঁহার মধ্যম পুত্রকেই সময়ে সময়ে সস্ত্রীক তাঁহার সহিত অধিক থাকিতে দেখিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় কখন সপ্তাহে, কখন মাসে, দুইদিন পাঁচদিন আবশ্যক মত নৈহাটি যাইয়া থাকিতেন। সেখানেও তিনি আলাহিদা একটি বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহাতে একাকীই থাকিতেন। পুত্র পৌত্র নাতি নাতনী লইয়া দাদামহাশয়েরা যেমন আমোদ প্রমোদে দিন কাটান, শাস্ত্রী মহাশয়কে সেরূপ পৌত্রাদিকে নাই দিতে দেখি নাই। তাঁহাকে একথা বলিলে, তিনি বলিতেন, তিনি এসব পারেন না। মোট কথা স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারে তাঁহার অনেকটা অনাসক্তি আসিয়াছিল। ইহা তাহারই নিদর্শন। তিনি জীবনটা মা সরস্বতীর সেবাতেই সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি আজীবন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, পুত্রদিগের নিকট অর্থের প্রত্যাশা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। বাণীর কৃপাও যেমন তিনি অজস্রধারায় লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কমলাও

তাঁহাকে স্নিগ্ধ কটাক্ষের কৃপায় প্লাবিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রেরা সকলেই কৃতি এবং কন্যারাও সুপাত্রস্থ সুতরাং তাঁহাকে সংসারের চিন্তা করিতে হয় নাই। ইহা কম পুণ্যের কথা নয়।

সন ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর) মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার সময় তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যালোকে প্রয়াণ করেন। মৃত্যু হঠাৎ হয়। এ সময় তাঁহার পুত্রেরা কেহই নিকটে ছিলেন না। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ৺ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দেহ কলিকাতার বাড়ী হইতে নৈহাটিতে লইয়া যাইয়া গঙ্গাতীরে সংকার করা হয়।

কর্ম্মজীবন

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে হরপ্রসাদ ১০০৲ টাকা মাহিনায় হেয়ার স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ এবং Translation master (অনুবাদ বিভাগের শিক্ষক) এই সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন। এই বর্ষেই লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী অসুস্থ হইলে, সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার বদলে হরপ্রসাদকে ক্যানিং কলেজে পাঠান হয়। এখানে তিনি ১৩ তের মাস সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পান। আবার ঐ বৎসরেই সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাকে বঙ্গীয় রাজসরকারের অনুবাদ বিভাগে (Bengali Translator's Office) সহকারী অনুবাদক করা হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ পান এবং আট বৎসর (১৮৯৪ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই গ্রন্থাগার তাঁহাকে বাঙ্গালার অমূল্য সম্পদ্ বৈষ্ণব-সাহিত্যের সন্ধান দেয়। তখন সার্ এল্‌ফ্রেড ক্রফ্ সাহেব ডাইরেক্টর্ অব্ পাব্‌লিক্ ইন্‌স্‌ট্রাক্‌টর্। তাঁহার অধীনে এই লাইব্রেরী। তিনি শাস্ত্রীর এই গ্রন্থাধ্যক্ষের কাজের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শাস্ত্রীকে প্রেসিডেন্‌সি কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক (Senior Professor of Sanskrit) করা হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের এম্-এ বিভাগ খুলিতে দেওয়া হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের

ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ (Principal of the Sanskrit College, Calcutta) এবং বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার (Registrar of Sanskrit Examinations in Bengal) এই গৌরবময় পদ দুটিতে উন্নীত হন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। কিন্তু পেন্‌সন্ লইলেও তাঁহাকে সরকার ছাড়িলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে পেন্‌সন্ গ্রহণের দিন হইতেই Bureau of information for the benefit of Civil Officers in Bengal, in history, religion, customs and folklore of Bengal (বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস, ধর্ম্ম, রীতি এবং প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে সংবাদ প্রদানকারীর) পদে নিয়োগ করেন। এই কাজ আজীবন তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। আর "এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গল" সম্পর্কে সেখানে রাজসরকারের প্রায় ১২০০০ পুথি আছে, ঐ পুথির বিস্তৃত বিবরণসহ তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার তাহার উপর ছিল। তাঁহাকে এজন্য দুইজন সহকারী পণ্ডিতও দেওয়া হইয়াছিল। এই কাজের জন্য তিনি মাসে ২০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তিনি আজীবন এই কাজ করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে উহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বঙ্গ-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই কাজের জন্য ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ স্বীকার করিতে হয়।

রাজসরকারে শাস্ত্রী মহাশয়ের চাকরির কথা বলিয়াছি। তাঁহার অবৈতনিক চাকরিরও অভাব ছিল না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁহাকে "গোপাল তাপনী উপনিষদ্" পুস্তকের ইংরাজীতে তর্জমা করিতে এবং "নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য" নামক পুস্তক রচনায়

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

সহায়তার ভার অর্পণ করেন। রাজা ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে শাস্ত্রীর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন :—"...during a protracted attack of illness, I felt the want of help and a friend of mine Babu Haraprasad Shastri M.A., offered me his co-operation and translated the abstract of 16 of the large works. His initials have been attached to the names of those works in a table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European Literature fully qualified him for the task and he did his work to my entire satisfaction. I must add, however, that I did not deem it necessary to compare all his renderings with the original." রাজাই শাস্ত্রীর প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষার গুরু। এই বাঙ্গালার "এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে" তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াই উহার "ফাইলোলজিক্যাল্ কমিটির" এবং "বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা পাব্লিকেশনের" ভার পান। তিনি ২২ বাইশ বৎসর এই কাজ করেন এবং ঐ সঙ্গে মফঃস্বলের পুস্তক-সম্পাদকগণের পুস্তকের শেষ প্রুফ্ সংশোধনের ভারও তাঁহার উপর ছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জুলাইতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহাকে সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ কার্য্যের প্রধান পরিচালক করা হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে "সোসাইটি" তাঁহাকে তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে "রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটির" বোম্বাই শাখার শতবার্ষিকী উৎসবে পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর ঐ

কাজগুলি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ সোসায়িটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং পরবৎসরও পুনর্ব্বার তাঁহাকেই সভাপতি করা হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী নৈহাটী মিউনিসিপালিটির কমিশনার্ হন। পরে ভাইসচেয়ারম্যান্ ও চেয়ারম্যান্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় ঐ মিউনিসিপালিটির আয়তন সুবৃহৎ ছিল। এখন উহা ভাঙ্গিয়া চারিটি মিউনিসিপালিটি গঠিত হইয়াছে। ইহার কাজ তিনি যে সুখ্যাতির সহিত করিয়াছিলেন, তাহা সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ। ভাইস্‌চেয়ারম্যান্ ও চেয়ারম্যানের কাজ করায় তাঁহার কার্য্য-পরিচালনার রীতি শিক্ষা হয়। তাঁহার সাহিত্য-সাধনাই তাঁহাকে মিউনিসিপালিটি ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। মিউনিসিপালিটির কথাতে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, "কমিশনার্ হওয়া লইয়া তোমার ছোট দাদাশ্বশুরের সহিত আমার খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত।"* এখন নৈহাটী মিউনিসিপালিটিতে শাস্ত্রীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু পরিতোষ ভট্টাচার্য্য কমিসনার্ আছেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী নৈহাটী বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং পরে ঐ বেঞ্চের সভাপতি হন। এই কাজ সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করিয়াছেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বাদশবৎসর যাবৎ তিনি "সেন্ট্রাল্ টেক্সট্ বুক্ কমিটির" সভ্য ছিলেন। মৃত্যুর এক দুই বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহাকে পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিতে দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ তাঁহাকে পুনর্ব্বার সভ্য করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাহাদিগের পুস্তক

---

*রায় মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল, সি আই ই বাহাদুর আমার ছোট দাদা শ্বশুর। তিনি হুগলীর সরকারী উকিল ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান্, বেঙ্গল্ লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্‌সিলের মেম্বর হইয়াছিলেন। আমার শ্বশুরদিগের আদি বাড়ী হালিসহরের অন্তর্গত "কোণা" গ্রাম। ইহা তখন নৈহাটি মিউনিসিপালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দাদাশ্বশুর ও ছোট দাদাশ্বশুর মহাশয়েরা পরে হুগলীতে বাড়ী করেন।

হইতে পাঠ্যাংশ নির্ব্বাচন সেবার করেন; তাহাদিগের একজনের নামের সহিত আমার মধ্যম ভ্রাতার নামের সাদৃশ্য থাকায়, শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে আমার ভ্রাতা মনে করিয়া, তাহার পুস্তক হইতে একটি অংশ নির্ব্বাচন করেন। ঐ নির্ব্বাচনের দুই তিন দিনের মধ্যেই কয়েক জনের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে ঐ কথা বলেন। আমি তাঁহাকে তখন জানাই যে, আমার ভ্রাতা তো তাঁহার কোন পুস্তক পাঠ্যাংশ নির্ব্বাচনের জন্য পাঠান নাই। ঐ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন এবং আজীবন উহার "ফেলো" ছিলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি "বুদ্ধিষ্ট্ টেক্সট্ এণ্ড রিসার্চ সোসাইটির" সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৩০৩ সালে) তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া, পর বৎসর সন ১৩০৪ হইতে ১৩০৯; ১৩১৮-১৯; ১৩২৩-২৫; ১৩৩১; ১৩৩৭-৩৮ পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দবার উহার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আর ১৩২০-২২; ১৩২৬-৩০; ১৩৩২-৩৬ সাল পর্য্যন্ত মোট তের বৎসর কাল উহার সভাপতি পদে সমাসীন ছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধগয়ার মন্দিরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সরকার যে "কমিশন" নিয়োগ করেন, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহযোগে তিনি সেই "কমিশনের" সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের "রিপোর্ট" সম্বন্ধে ছোট লাট Mr. J. A. Bourdillon তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—

BELVEDERE,
Calcutta
17th. July, 1903.

My dear Sir,

I find that I have not hitherto formally acknowledged the receipt of the report on the Budh-

Gaya Temple which has been submitted by Mr. Justice Sarada Charan Mitra and yourself, after the enquiries made by you at the end of March last.

Let me do so now: and in doing so allow me to express to you the acknowledgement of Government for the complete, erudite, valuable memorandum which you have prepared......In any case it will remain a monument of your learning, assiduity and impartiality.

Believe to be,
yours truly,
J. A. Bourdillon.

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেবের সহিত উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিবার জন্য সরকার তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি অধ্যাপকের সহিত পুরী, বাঁকীপুর, নলান্দা, রাজগৃহ, কাশী, লক্ষ্ণৌ, বলরামপুর, সেট্ মাহেট, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, ঝাঁসি, খাজুরাহো, এবং বোম্বাই ভ্রমণ করেন। এই সকল স্থানে তাঁহাকে পুরতত্ত্ববিভাগীয় প্রাচীনদ্রব্যসংগ্রহশালা (Archeological Museums), প্রত্নতত্ত্বের খননকার্য্য (Excavations), মন্দির এবং পুথি পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি ম্যাক্সমূলার-স্মৃতিভবনের জন্য কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বৈদিক-পুথি সংগ্রহ করেন। তিনি আরও প্রায় ৭০০০ পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এইগুলি নেপালের মহারাজা অক্সফোর্ডের বোড্‌লিয়ান্ পুস্তকাগারে (Bodleian Library) দান করেন। এই সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্‌সেলর্ লর্ড কর্জ্জন্ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন,—

1, Corlton House
Terrace, S. W.
5th. January, 1910.

My dear Sir,

I have heard from Oxford of the invaluable part that you have played in arranging for the purchase, the cataloguing and despatch to England, of the wonderful collection of Sanskrit manuscripts, which Maharaja Sir Chandra Shumshere Jung of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library; and I should like both as a former Viceroy and Chancellor of the University to send you a most sincere line of thanks for the great service which your erudition, good will and indefatiguable exertion have enabled you to render to us.

With the best wishes for the new year and with the hope that scholars like yourself may never be wanting in India.

I am,
Yours faithfully,
Curzon of Keddleston.

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের জন্য "এসিয়াটিক সোসাইটি" রাজপুতনার ভাট-চারণদিগের গান-পুথি (Bardic Manuscripts in Rajputana) সংগ্রহ করিবার উপায় স্থির করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্টের এই কাজের জন্য তাঁহাকে ৩।৪ তিন চার বার রাজপুতনা ঘুরিতে হয়। এই কাজ করিতে তাঁহার চার বৎসর লাগে।

এই রাজপুত-সাহিত্য ও ভাট-চারণদিগের পুথি সম্বন্ধে তিনি চার বৎসর যে চারিটি মন্তব্য (report) দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজপুতনার ইতিহাসে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য বাহির হইয়াছে। এই ভাট-চারণের গান ও সংস্কৃত পুথির জন্য তাঁহাকে রাজপুতনা, মালোয়া, নেপাল, উড়িষ্যা, কাশী, বিহার এবং ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্য পাইয়া সরকার বাহাদুর এই সকল পুস্তক সংগ্রহের জন্য এল্ টেসিটোরি নামক একজন ইটালিয়ান্ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে চারবার গিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার নেপালে যান; তাহার পর ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার এবং ১৯২২শে চতুর্থবার যান।

নেপাল হইতে শাস্ত্রী মহাশয় "রামচরিত" নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন। এই খানিতে প্রত্যেক শ্লোকে দুই রকম অর্থ হয়—এক অর্থে রামায়ণের রামের, আর এক অর্থে বাঙ্গালা দেশের পালবংশের রাজা রামপালের ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐ নেপাল হইতেই তিনি বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি কীর্ত্তনের পদ এবং দুই একখানি দোঁহাকোষও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ১৩২৩ সালে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" সেই পুস্তক মুদ্রিত করে; ইহার সম্পাদক (editor) ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয় নিজে। তিনি বলেন যে, পদগুলি ৯৫০ হইতে ১১৫০ সালের লেখা এবং সেগুলি প্রাচীন বাঙ্গালায় লেখা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে সিমলায় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্গণের যে সম্মিলনী (Oriental Conference) হয়, সরকার সেই সভায় বাঙ্গালা হইতে তাঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি সেখানে গিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের উন্নতির জন্য অনেক পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং অনেক মন্তব্য (notes) দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি সার্ জন্ মার্শেল সাহেবের অনুরোধে রাজকীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের জন্য প্রায় ১২০০০ পুথি ক্রয় করিয়া দেন। ইহার বেদের পুথিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। এই পুথিগুলির তত্ত্বাবধানাদি করিবার জন্য মার্শেল সাহেব তাঁহার অধীনে একটি অস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। সেই মতই কার্য্য গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ কাল পর্য্যন্ত চলিয়াছে। পুথিগুলি "ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে" রক্ষিত আছে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে (১৩২১ সালে) বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতি এবং সাহিত্য শাখারও সভাপতি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে (১৩২৪ সালে) তিনি মেদিনীপুর-সাহিত্য-সম্মিলন এবং মেদিনীপুর শাখা পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হন। ৪ঠা মাঘ ১৩২৬ সালে (১৯২০ খৃঃ অঃ) হেতমপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি হন। ১৩২৯ সালে কলিকাতায় ভারত-হিন্দু সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে (১৩৩১ সালে) তিনি রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে মথুরায় তিনি নিখিল ভারত সংস্কৃত মহাসভার (All India Sansrit Congress) সভাপতি হইয়া সংস্কৃত ভাষাতেই অভিভাষণ দিয়াছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে লাহোরে "ওরিয়েণ্টাল কন্ফারেন্সে" সভাপতিত্ব করেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পা জোড়া লাগিয়া যায় বটে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর হয় নাই, ভাল হাঁটিতে পারিতেন না, "ক্লাচ্" ব্যবহার করিতে হইত। এই "কন্ফারেন্সের" সময় তিনি ভাল করিয়া দাঁড়াইতেও পারিতেন না। কিন্তু এই সকল বিষয়ে

তাঁহার এত উৎসাহ ছিল যে, সে অবস্থায় কেহ বাড়ী হইতে বাহির হয় না, তবুও তিনি "ইন্‌ভেলিড্ চেয়ার কিনিয়া তাহা সঙ্গে লইয়া লাহোরের "কন্‌ফারেন্সে" গিয়াছিলেন।

তিনি "ইনডিয়ান্ মিউজিয়মের" অন্যতম "ট্রাষ্টি" ছিলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি "বৃহত্তর-ভারত-পরিষদের" সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৩৮ সালের ২৫ বৈশাখ (১৯৩১ খৃঃ অঃ) তিনি "রবীন্দ্র জয়ন্তী" উদ্বোধন সভার সভাপতিত্ব করেন।

সম্মান প্রাপ্তি :--

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহার "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রাপ্তি হয়। তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, Age of Consent Bill সম্বন্ধে তিনি যে note দিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করেন। ১৩১৬ সালে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" তাঁহাকে তাহার বিশিষ্ট সদস্য করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে "সি, আই, ই" উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতের "রয়েল্ এসিয়াটিক সোসাইটির" বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত হন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" এই উপলক্ষে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে (১৩২৯ সালে, ১৩ই আষাঢ়) তাহার সম্বর্দ্ধনা হয়। তাহাকে একটি পিতলের থালায় করিয়া গরদের জোড়, একটি সোণার আংটী ও রূপার চন্দনের বাটী তাহাকে উপঢৌকন দেওয়া যায়। এই সংবর্দ্ধনার প্রস্তাব আমিই পরিষদে উপস্থিত করি, প্রতিবাদ হয়, শেষে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু আমার কলিকাতায় অনুপস্থিতি কালেই পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সংবর্দ্ধনার উৎসব সম্পন্ন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদেশের গবর্ণর লর্ড লিটন্ বাহাদুর ঐ সংস্কৃত কলেজে শাস্ত্রী মহাশয়ের তৈল-

চিত্র (Oil Painting) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু বান্ধব আমরা সকলে ঐ তৈলচিত্র নির্ম্মাণাদির ব্যয় বহন করিয়াছিলাম। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মান সূচক "ডি লিট্" উপাধিতে বিভূষিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ১৩৩৮ সালের ১৪ই ভাদ্র (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পঁচাত্তর বৎসর বয়স প্রাপ্তি উপলক্ষে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" পক্ষ হইতে "হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন সমিতি" তাহার "লেখ-মালার" মুদ্রিত প্রথমখণ্ড এবং অমুদ্রিত দ্বিতীয়খণ্ডের প্রবন্ধাবলী সমর্পণ করে। আর ঐ উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে বন্ধুসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য ঐ লেখমালার দ্বিতীয় খণ্ড তাঁহার পরলোকগমনের পরবৎসর মুদ্রিত হইয়াছে। এই "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা" ১ম ও ২য় খণ্ড মুদ্রণ কল্পে আমরা সকলেই লেখা ও অর্থ দিলেও কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত বিমলা চরণ লাহা প্রচুর আথিক সাহায্য না করিলে একাজ সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইত। "এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল" এবং "হিন্দু ইউনি-ভারসিটি" তাঁহাকে আপনাদের "ফেলো" করিয়াছিলেন এবং "বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটিও" তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য করিয়া লইয়াছিলেন।
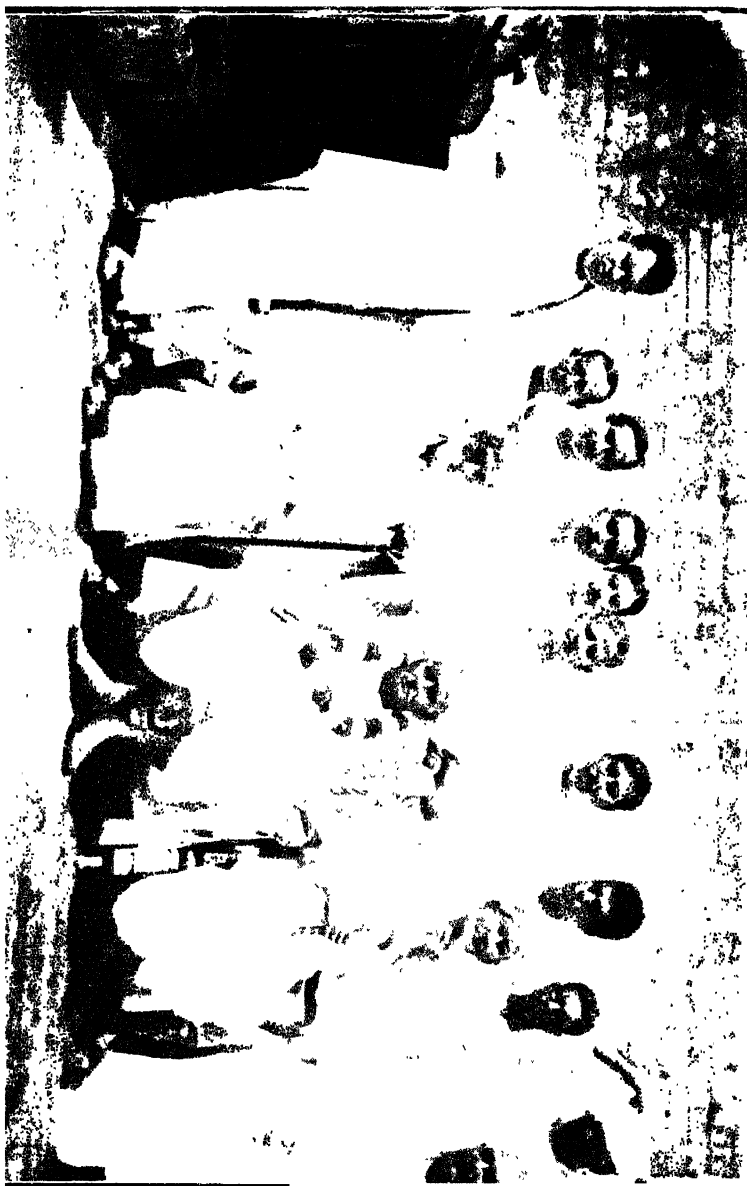
লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক :—

হরপ্রসাদ উত্তরকালে একজন প্রতিভাশালী লেখক হইবেন, তাহার নিদর্শন, তাঁহার পঠদ্দশাতেই সূচনা করে।. তাঁহার বি, এ পড়িবার সময় মহারাজা হোলকার কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসেন এবং "প্রাচীন সংস্কৃত লেখকদিগের মতে স্ত্রীচরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ" সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে পুরস্কার দিবেন বলিয়া জানান। হরপ্রসাদ ঐ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ "ভারত মহিলা" নামে খ্যাত। ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে এবং ইহা পুরস্কারের প্রবন্ধের জন্য লিখিত হইলেও, এ বিষয়ে ইহা প্রামাণ্য হইয়া রহিয়াছে।

এই "ভারত মহিলা" মাসিক পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য হরপ্রসাদ আর্য্যদর্শনের সম্পাদক পরলোকগত যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি উহা ছাপিতে সম্মত না হইলে, হরপ্রসাদ রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যান। তিনি আমাদের স্বনামধন্য বঙ্কিম চন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদের আলাপ করাইয়া দেন এবং ঐ "ভারত মহিলার" পাণ্ডুলিপি দেখিতে অনুরোধ করেন। বঙ্কিমবাবু তখন "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদক ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। বঙ্কিমবাবুর বাড়ী কাঁটালপাড়া ও হরপ্রসাদের বাড়ী নৈহাটী, এপাড়া ওপাড়া, কিন্তু উভয়ের রীতিমত পরিচয় ছিল না। বিশেষ বঙ্কিমবাবু তখন বর্ষীয়ান্ পদস্থ ও রাশভারী লোক; তাঁহার সঙ্গে কলেজের এক ছাত্রের দেখা করা ও তাহার লেখা "বঙ্গদর্শনে" ছাপাইবার জন্য বলা সম্ভবপর ছিল না। যাহাই হউক রাম ফক্কড় বলিয়া একজন লোক নৈহাটীতে ছিলেন, তিনি বঙ্কিম বাবুর নিকট যাওয়া আসা করিতেন; তাহার নিকট হরপ্রসাদ শুনিলেন যে, বঙ্কিমবাবু তাহার লেখা 'ভাল হয়েছে বলেছেন'। তখন সাহস পাইয়া তিনি দুইবার বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে দেখা করেন। বঙ্কিমবাবু তাহার লেখা খুব ভাল হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করেন এবং তিন বারে অর্থাৎ বঙ্গদর্শনের তিন সংখ্যায় ঐ "ভারত মহিলা" বাহির করেন। বঙ্গদর্শনের ৪র্থ বর্ষেই ইহা মুদ্রিত হয়। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে এই "ভারত মহিলা" লইয়াই তাহার প্রথম পরিচয় হয়। বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদের বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রথমকার প্রায় প্রবন্ধেই তাহার "শরৎ" নাম স্বাক্ষর আছে। তখন তিনি হরপ্রসাদ নামেই পরিচিত, সুতরাং তাহার বাল্যকালের শরৎ নাম কাহারও জানা ছিল না। এই অজ্ঞাত শরৎ নামেই তিনি অজ্ঞাত নামা লেখকরূপে তৎকালে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে তিনি এত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, সবগুলি একত্র করিলে বঙ্গদর্শনের দুই বৎসরে সমস্ত লেখা একস্থানে করিলে যত হয় তত হইবে। 'হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনা লেখমালার'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় ভাগে এবং The Indian Historical Quarterly, Volume IX তে প্রবন্ধগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি সম্ভব হয় পরিশিষ্টে প্রবন্ধাদির তালিকা প্রদত্ত হইবে।

সপ্তম বর্ষের বঙ্গদর্শনে হরপ্রসাদের "বাল্মিকীর জয়" নামক পুস্তক বাহির হয়। ইহা এক অদ্ভুত পুস্তক। লেখকের কল্পনা শক্তির পূর্ণ বিকাশ ইহাতে হইয়াছে। ইহা গদ্যে কাব্য। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং এই পুস্তক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"The course of imagination of this young writer is like the strides of a proud and haughty Lion." সেক্সপিয়ারের একজন বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক ডাওডেন্ (Professer Dowen) বলিয়াছিলেন "It will extend the horizons of Western Imagination." ডাঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয় ইহাকে বাঙ্গালা-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। এই "বাল্মিকীর জয়" বহু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বঙ্গদর্শনের ৯ম বর্ষে (১২৮৯ সাল) অাশোকরাজ্যের ঘটনা সম্বলিত তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস "কাঞ্চনমালা" প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখকের নাম ছিল না। সার্ রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় এখানিকে বঙ্কিম বাবুর শ্রেষ্ঠ লেখা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। অবশ্য পরে তিনি জানিয়া ছিলেন যে উহা কাহার লেখা। এই উপন্যাস বাহির হইলে স্বয়ং ঔপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বীই বা হরপ্রসাদ হইয়া পড়েন, এই চিন্তা তাঁহার আসিয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু মহলে এ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া রাজকুমার বাবু হরপ্রসাদকে উপন্যাস লিখিতে মানা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "তুমি এখন নাই লিখিলে you will survive him long, লেখার সময় তো ঢের পাবে, বন্ধুবিচ্ছেদ নাই বা করিলে।" হরপ্রসাদ তাহার পর আর গল্প লিখেন নাই। শেষ বয়সে "বেণের

মেয়ে” নামক এক গল্পের বই লিখিয়াছিলেন। বৌদ্ধ-প্লাবিত বাঙ্গালার সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এই উপন্যাসে দেখান হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের গল্পের বই লিখিলে কি হইবে, তাহাতে তো ইতিহাসের প্রচুর তথ্য থাকিবেই, আছেও তাই, অবশ্য তাহাতে গল্পাংশ নিরেশ হয় নাই, বরং ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিই পাইয়াছে; কেবল তাহা এখনকার কামায়ন উপন্যাস নহে বলিয়া, এ যুগের নব্য, কচি, তরুণ বা সবুজ দিগের ঠিক মুখরোচক না হইতে পারে কিন্তু ইহা একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, আর ইহার ভাষা তো আদর্শ।

হরপ্রসাদ “মেঘদূত ব্যাখ্যা” নাম দিয়া কবি কালিদাসের অমর কাব্য “মেঘদূতের” অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপল্। এই বই লইয়া তাঁহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা রাজসরকারে প্রচার করেন যে, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপল্ অশ্লীল পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে সরকার বাহাদুর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের মত গ্রহণ করেন। তাঁহারা ইহা ‘অশ্লীলতার অমার্জ্জনীয় দোষে দুষ্ট’ বলিয়া মত দিয়া ছিলেন। তাহাতে হরপ্রসাদের কৈফিয়ৎ তলব হয়। অবশ্য তিনি যে কৈফিয়ৎ দেন তাহাতে সকল গোলোযোগ কাটিয়া যায়। হায়রে সেকাল, এই পুস্তক যদি অশ্লীল হয়, তাহা হইলে আজকাল অখ্যাতনামাদিগের কথা নাই ধরিলাম, খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদিগের উপন্যাস ও চিত্রাবলি যাহা পুস্তকাকারে ও মাসিকপত্রিকায় প্রকাশ হইতেছে, সে গুলির কি দশা ঘটে! সকলি কাল মাহাত্ম্য। যেমন চল্‌তি আছে “ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ,” এখন সেইরূপ “কালস্য চিত্রা গতিঃ” বলিতে হয়। তখন হরপ্রসাদ “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের” সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিন্তু পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যেরা ঐ পুস্তকের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা লইয়া তাঁহার বিপক্ষে যাওয়ায়, তিনি পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি কোন সভায় টাকীর

মুন্সী জমীদার রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে পরিষদে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমি খেউড় গাই আমি কি আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসার জুগ্যি।" যাহা হউক শেষে পরিষদের একনিষ্ঠ কল্যাণকামী সেবক স্বর্গগত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর একান্ত অনুরোধে, তাঁহাকে পরিষদে ফিরিয়া আসিতে হয়। তিনি পরিষদের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতে শুধু পরিষদ্ নয়, কলিকাতার সমগ্র লাইব্রেরীই লাভবান্ হইয়াছে এবং আজও যে পরিষৎ মন্দির উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁহারই জন্য। যথাস্থানে এ সকল কথার আলোচনা হইবে।

তিনি "ভারতবর্ষের ইতিহাস" বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার ইংরাজীও ছিল। ইহাতে তিনি হিন্দুযুগ বা প্রাচীন হিন্দুদিগের বিবরণ লিখিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল ঐতিহাসিক ছিলেন, তাহারা সকলে ইংরাজ বা বিদেশী বলিলেই হয়। সকলেই বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন, হিন্দুযুগ সম্বন্ধে একরূপ নিরব, আর যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও আবোল তাবোল মাত্র। হরপ্রসাদই সর্ব্বপ্রথম ধারাবাহিক হিন্দুযুগের ঘটনা লিখেন। তাঁহার ইংরাজী ভারতবর্ষের ইতিহাস (A school History of India) বিশ্ববিদ্যালয় সমাদরে বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য করিয়াছিল। তাহার এই বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভারত ইতিহাসে নূতন পথ খুলিয়া দেয়। এই ইতিহাসই তাহার ভাগ্যে মা-লক্ষ্মীর কৃপা কটাক্ষ। ইহাতেই তিনি ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পান। তাহাতেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন। কলিকাতার পটলডাঙ্গার বাড়ী প্রভৃতি তাহারই সুফল।

আমরা দেখিতে পাই যাহারা মিউনিসিপালিটিতে একবার কমিশনার রূপে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহাদের কেমন নেশা হয়, উহা ছাড়িতে চান না, তার পর যাহারা ভাইস্ চেয়ারম্যান্ বা চেয়ারম্যান্ হন, তাহাদের

কথা সহজেই অনুমেয়। ইহাতে যে কি মাদকতা আছে জানি না; যাহারা একবার ও আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই তাহার স্বরূপ বলিবার অধিকারী। মিউনিসিপালিটির এ হেন চেয়ারম্যানিও হরপ্রসাদ সাহিত্য-সাধনার খাতিরে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি মূল বই বহু না লিখিলেও, বহু বই সম্পাদন করিয়াছেন, বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বহু অভিভাষণ দিয়াছেন, পুথির অনুসন্ধানের এবং পুথির তালিকা সম্বলিত বহু বিবরণ লিখিয়াছেন। এই সকল পুথির তালিকার মুখবন্ধে কত নূতন নূতন তথ্য যে তিনি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অমূল্য। তাঁহার অনেক অভিভাষণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পাঠ্য পুস্তক দুইখানি এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঁচখানি লিখিয়াছিলেন। তিনি তিনখানি বাঙ্গালা, একখানি মৈথিলি এবং আটখানি সংস্কৃত ও বৌদ্ধ গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তিনি বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, বহু প্রাচীন পুথির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধান ও গবেষণায় বাঙ্গালা, বৌদ্ধ, সংস্কৃত, সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন নূতন আলোকপাত করিয়াছে, আবার রাজপুত জাতির ইতিহাসে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি নূতন নূতন প্রচুর উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকৃত ইতিহাস রচনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

তিনি "আর্কিওলজিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্টের" অবৈতনিক লেখক (Honorary Correspondent) ছিলেন। "বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটীর" অনররী মেম্বর ছিলেন। ইহার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ইহার সভাতেও বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছেন।

এসিয়াটিক্ সোসাইটি ঃ—

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গলে" তিনি বহুরূপে বহু কাজ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছি যে, তিনি

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। রাজার দেহান্তে তাঁহার সমুদায় কার্য্যের ভার তাঁহার উপর পড়ে। ঐ ভার গ্রহণ করিয়া তিনি ৮০০০ ভাল পুথি সংগ্রহ করেন এবং ছয়টি সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ লিখেন। তিনি আট খণ্ড সংস্কৃত পুথির বিবরণ (Notices of Sanskrit Manuscripts) মুদ্রিত করেন, উহাদের মধ্যে দুই খণ্ডে তালপত্রের পুস্তকের বিবরণ ও কাগজে লেখা বাছাই করা নেপালের "দরবার লাইব্রেরীর" পুথির বিবরণ আছে। তাঁহার লিখিত বিবরণাদি কি প্রতীচ্যে, কি প্রাচ্যে, সর্ব্বত্রই পণ্ডিত মহলে অশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে এবং প্রামাণিক (reference) বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। তাঁহার অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি গভর্ণমেণ্টের সংগৃহীত ১২০০০ হাজার পুথির সূচীপত্র। ইহা শুধু নামের তালিকা নহে, ইহা বিবরণ-সহ তালিকা। এই Descriptive catalogue সম্পূর্ণই তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় উহার ছয় খণ্ড ব্যাকরণ-ভাগ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ছাপা হয়। আর কাব্য-খণ্ডের সমুদায়ই ছাপা হয়, কেবল তাহার মুখবন্ধ সম্পূর্ণ ছাপা হয় নাই। মুখবন্ধ সম্পূর্ণ লেখাও হয় নাই, উহার কতক অংশ ছাপা হইতেছিল এবং লেখাও চলিতেছিল, এমন অবস্থায় পরলোকে তাঁহার ডাক পড়ে, তিনি অনন্তধামে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার লিখিত অসমাপ্ত মুখবন্ধ বাদ দিয়া, উহা অপরের লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত হইয়া ছাপা হইয়াছে বটে, কিন্তু হরপ্রসাদের সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধ ইহার সহিত যুক্ত থাকিলে, কাব্য-জগতে ইহার যে জৌলুষ হইত এবং ইহা যেরূপ এক অনন্যসাধারণ বস্তু হইয়া থাকিত তাহার নিতান্ত অভাব হইল। কাব্যে হরপ্রসাদের মত পণ্ডিত বিরল, বোধ হয় এত বড় পণ্ডিত ইদানিং জন্মায় নাই, বিশেষ কালিদাসের কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সীমা ছিল না, স্বয়ং মল্লিনাথও কালিদাসের সৌন্দর্য্য হর-প্রসাদের মত অনুভব করিয়া ছিলেন কি না সন্দেহ হয়। তাঁহার মৃত্যুতে

কাব্যের তালিকায় মুখবন্ধ সুধু অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল বলিলেই বেশী বলা হইল না, কাব্যজগৎ এক অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব-সুন্দর বস্তু হইতে চিরতরে বঞ্চিত রহিল। যে ক্ষতি হইয়া গেল তাহা আর কখনও পূরণ হইবে না। তাঁহার দীর্ঘজীবন, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় অধিকার, তৎসহ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, প্রত্নতত্ত্বে অসাধারণ জ্ঞান, আজীবন পুস্তকাদি পাঠ করিবার নিয়ত অভ্যাস ও অধ্যবসায়, বিষয় পর্য্যবেক্ষণে সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রস ও সৌন্দর্য্য-বোধের অনন্যসাধারণ শক্তি, এতগুলি সুযোগ সমন্বয়ে যে বস্তু তাঁহার হাত হইতে বাহির হইত, তাহার অভাব হইল, ইহার পূরণ আর কখনও হইতে পারে না। এই যে পুথির তালিকা ছাপা হইয়াছে, তাহাতে হরপ্রসাদের আর্থিক দান বড় কম নহে। তিনি ১৮০০০৲ আঠার হাজার টাকা ইহার মুদ্রণে দিয়াছেন। [পরিশিষ্ট খ দ্রষ্টব্য]। কেবল "এসিয়াটিক্ সোসাইটির" অনুরোধেই তথায় ন্যস্ত গভর্ণমেণ্টের এই ১২০০০ বার হাজার পুথির সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি Preliminary report on the Search of Bardic Manuscripts এবং চার বৎসরের এই সংক্রান্ত চারিটি Progress report লিখিয়াছিলেন। এই "এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে" তিনি সভাপতি রূপে দুইবার যে দুইটি অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, সেইরূপ ইতিহাস নূতন তথ্যে পুষ্ট হইয়াছিল। এখানে তিনি ইহার কাউন্সিলের সভ্য, কোন না কোন বিষয়ের সম্পাদক, সহকারী সভাপতি বা সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছেন। নানাবিধ প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, এবং নানা গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার বহু লেখা "সোসাইটির জারনালে" "বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকায়" এবং "মেময়ার্সে" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার যাহাতে কল্যাণ হয়,

সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বদাই ছিল। "সোসাইটি" তাঁহাকে তাহাদের "ফেলো" করিয়া লইয়া এবং দুই বৎসর সভাপতি করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ঃ—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরপ্রসাদ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহার "মেঘদূত-ব্যাখ্যা" পুস্তক সম্পর্কে ইহার কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু বাণী-সেবকের পক্ষে বাণীমন্দির ত্যাগ অসম্ভব; সেজন্য রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না, তাঁহাকে আবার পরিষদে আসিতে হইল এবং কর্ত্তৃত্বও গ্রহণ করিতে হইল। তিনি আর আজীবন পরিষদ্ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিষদের সুখে দুঃখে তিনি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ইহার চৌদ্দ বার সহকারী সভাপতি ও তের বার সভাপতি হইয়াছিলেন। এখানে সভাপতিরূপে তিনি যে সকল অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা-সাহিত্য ও ইতিহাসের অমূল্য সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম অভিভাষণে তিনি প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে এ বিষয়ের সন্ধান কেহই দিতে পারেন নাই। তিনিই এই অভিভাষণে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক নূতন দিক্ খুলিয়া দেন। তাঁহার প্রত্যেক অভিভাষণ, প্রত্যেক প্রবন্ধই মৌলিকতায় পরিপূর্ণ। পরিষদেরও কয়েক-খানি পুস্তক তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালা-ভাষা যে কত প্রাচীন তাহা এই পুস্তক প্রমাণ করিয়াছে। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালা ভাষার আদর যে কতখানি ছিল, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁহার অনুসন্ধান

গবেষণার ফলে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনত্ব ও গৌরব প্রভৃত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ এজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার পরিচালনাধীনে পরিষদের উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছিল। পরিষদে যে সকল গচ্ছিত তহবিল ছিল, তাহা হইতে প্রায় সাত হাজার টাকা, নিজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষদ্ খরচ করিয়া ফেলায়, সভ্যদিগের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাঁহার সভাপতিত্ব কালেই তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৩৩৩ সনে ৬৭৪৭৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া ঐ ব্যয়িত গচ্ছিত তহবিলগুলি পূর্ণ করা হয়। এই ঘটনার পর পরিষদে আর এক ঘোর বিপদ দেখা দেয়। পরিষদ্ মন্দির এমন ভাবে ফাট ধরিয়াছিল যে "কলিকাতা কর্পোরেসন্" ইহাকে বিপদ্‌জনক (dangerous building) পর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলেন। তখন হয় এই বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় নতুবা সম্পূর্ণ সংস্কার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখনি মেরামতের নিতান্ত আবশ্যক। কন্‌ট্রাক্টার ১৬০০০৲ টাকা মেরামত করিতে লাগিবে জানায়। পরিষদের স্থায়ি-ভাণ্ডারে অর্থাভাব, এই মন্দির-সংস্কারের টাকা কোথা হইতে আসিবে, এই সে দিন অতগুলি টাকা চাঁদা তুলিয়া গচ্ছিত তহবিলের ঋণ শোধ করা হইয়াছে, আর চাঁদা কে দিবে, কর্ত্তৃপক্ষ চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। আমি তখন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য। আমি পরিষদের সদস্য বহুকাল থাকিলেও ১৩২৭ সালে শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে ইহার সহকারী সম্পাদক করেন। আমি সাত বৎসর ইহার সহকারী সম্পাদকরূপে, পাঁচ বৎসর কোষাধ্যক্ষরূপে এবং আরও কয়েক বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যরূপে কাজ করিয়াছি। সাহিত্যপরিষদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্যই হয়। পরিষদের এই সঙ্কটকালে তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে দুঃখের সহিত আমায় বলেন "গণপতি, আমার হাতেই পরিষদের বাড়ীটি যাবে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ষু এই কথা বলিতে বলিতে জলপূর্ণ হইয়া আসিল। ইহা

শ্রীবিধুভূষণ সরকার

দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারি নাই, বলিয়াছিলাম "তা হবে না, আপনার হাতে এর সমাধি হতে দিব না, চেষ্টা করে দেখি, ফল ভগবানের হাতে।" আমার মধ্যম অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেসনের কাউন্‌সিলার্ তখনও ছিলেন, ভগবৎ কৃপায় এখনও আছেন। তাঁহাকে আমাদিগের বিপদের কথা বলিয়া বলিলাম যে, পরিষদের বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কর্পোরেসন্ হইতে Dangerous building এর Notice আসিয়াছে, পরিষদে টাকা নাই, কর্পোরেসন্ হইতে ১৬০০০৲ টাকা বাড়ী মেরামতের জন্য Capital Grant দেওয়াতেই হইবে, নতুবা কোন মতেই চলিবে না। তিনি বলিলেন যে, Corporation ইতিপূর্ব্বে লাইব্রেরীর জন্য কোথাও Capital Grant দেয় নাই, সুতরাং ব্যাপার বড় গুরুতর, হওয়া কঠিন। আমার অনুরোধে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন স্বীকার করিলেন। তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর কর্পোরেসনের মেয়র যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। কর্পোরেসনে আমার মেজদাদার খাতির ও প্রতিপত্তি ভগবৎ কৃপায় সি, আর্. দাসের আমল হইতে আজও পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে। এইটুকুর ভরসাতেই মেজদাদা পরিষদের জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, ১৬০০০৲ ষোল হাজার নয়, ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকার আবেদন কর। আমি সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়া ১৬০০০৲ স্থলে ২৫০০০৲ টাকার দরখাস্ত করাইলাম। পরিষদের অনেকেই ১৬ পরিবর্ত্তে ২৫ করিতে কিন্তু হইলেন, আমি জোর করিয়াই তাহা করাইলাম। তাহারপর দাদার পরামর্শমত তাঁহার সহিত শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়কে লইয়া মেয়র সেনগুপ্তের এবং রায় শ্রীযুক্ত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের বাড়ীতে উহাদের সহিত দেখা করাই। দাদা বলিলেন, আর কাহারও সহিত দেখা করিবার আবশ্যক

নাই, তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন। কর্পোরেসনের "ল অফিসার" বাধা তুলিলেন যে, কর্পোরেসনের নিয়মে বাধিতেছে, কি করিয়া এই "গ্রাণ্ট" দেওয়া যাইবে, পূর্ব্বেও এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। মেজদাদা "ল অফিসারের" সহিত দেখা করিয়া এবং নিয়মের আলোচনা করিয়া, এই নিয়মের বাধা দূর করাইয়া তাঁহাকে দিয়া অনুকূলে অভিমত দেওয়াইয়া লন। তাহারপর "ফাইনান্স এণ্ড ষ্টেটস্ জেনারাল্ পার্পস্ কমিটি" হইতে উহা মঞ্জুর করান, অতঃপর কর্পোরেসনের "জেনারল মিটিং" এ ২৫০০০৲ টাকাই "ক্লোজিং ব্যালেন্স" হইতে দেওয়া হউক বলিয়া চরম মঞ্জুর করাইয়া লন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টাতেই সকল কাউন্সিলারগণ একমত হইয়া এই কল্যাণকর কার্য্য করেন। পরিষদেরও সে সময় সুসময় পড়িয়াছিল; তাহার সভ্যগণের মধ্যে কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা, শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাশ ও শ্রীযুক্ত ওয়ায়েদ্ হোসেন্ প্রভৃতি কাউন্সিলার্ ছিলেন যদিও আবশ্যক ছিল না, তথাপি পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ মেজদাদাকে একাজে সহায়তা করিবার জন্য, ঐ টাকা মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে একদিন সকল কাউন্সিলারগণকে পরিষদ্ মন্দিরে মিষ্টমুখ করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রমুখ কয়েকজন পরিষদের সভ্যের প্ররোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বুঝান হইয়াছিল যে, কর্পোরেসনের কাউন্সিলারগণকে পরিষদে জলযোগের নিমন্ত্রণের অছিলায় আনিয়া পরিষৎ মন্দিরের অবস্থা দেখাইলে তাঁহাদের সমধিক সহানুভূতি পাওয়া যাইবে। আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এ কাজ করা সাব্যস্ত করিয়া, এই ৯০ জন কাউন্সিলারকে ও তৎসঙ্গে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য প্রভৃতির জলযোগে আপ্যায়নের জন্য ৩০০৲ টাকা তুলেন। ঐ টাকা শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং ১০০৲, হীরেন বাবু ১০০৲ এবং নরেনবাবু ১০০৲ দেন। কিন্তু পরিষদের

প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য বিদ্যাভূষণকে জানান যে, ৫০০৲ টাকার কম, একাজ হইবে না। শাস্ত্রী মহাশয় উহা শুনিয়া বিপন্ন হইলেন, তখন আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া পরামর্শ চাহিলেন এবং ইহা আবশ্যক কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও বলিলেন যে আমাকেও ১০০৲ টাকা দিতে হইবে। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ঐ ৩০০৲ টাকাতেই সুচারুরূপেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, না হইলে আমি টাকা দিব। তবে ইহা করিবার আদৌ আবশ্যক আছে কি না তাহা মেজদাদাকে (বিধুভূষণ বাবুকে) জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন যে, পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় কোনরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে আবশ্যক তিনি বোধ করেন না, আর কাউন্সিলারগণকে পরিষদে লইয়া গেলেও যে ফল হইবে, লইয়া না গেলেও তাহাই হইবে, যাহাতে কার্য্য হইবে তাহা তিনি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তবে "অধিকন্তু ন দোষায়" হিসাবে পরিষদ্ কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেন একাজ করিতে পারেন, ইহা তাঁহাদের বিবেচনা সাপেক্ষ। আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার কথা বলিলাম। তিনি পরামর্শ করিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করাই সাব্যস্ত করিয়া আমাকে পরিষদে লইয়া গেলেন। কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া কি ভাবে কি করিতে হইবে বলিয়াদিলাম; ঐ ৩০০৲ টাকার মধ্যেই সমস্তই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইল। পরিষদের এই নিমন্ত্রণে, কর্পোরেসনের বৎসরের শেষ সময় ও সম্মুখে ইলেক্‌সন্ থাকায়, কাউন্সিলার্-দিগের সিকিও আসিতে পারিলেন না। আর আমাদের কর্ম্মীপুরুষ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁহার দলবল লইয়া কাউন্সিলারগণের বাড়ী চসিয়া ফেলিয়াছিলেন। এ সকলের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। এই কর্পোরেসনের কাউন্সিলারদিগকে নিমন্ত্রণ করা উপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার এক পত্র ব্যবহারও হয়, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।—

ওঁতৎসৎওঁ

Ganapati Sircar
Vidyaratna M.R.A.S.

69, Beliaghatta Main Road,
Calcutta, 5th March 1927.

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু

প্রণাম জানিবেন।

গত কল্য বাড়ী ফিরিয়া পরিষদের নিমন্ত্রণ কথা মেজদাদাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয়টি আমার উপর ছাড়িয়া যদি দিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। যেমন কথা ছিল যে তাহার সহিত কথা বলিয়া ইহা করিবেন, তাহা করা হইল না, ফল কতদূর কি হইবে জানি না; কেননা তিনি ঐ নিমন্ত্রণ করা এখন সম্ভব কি না তাহা কয়েকজন কাউন্‌সিলারের সহিত পরামর্শ গতকল্য করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে এ সময়ে তাহাদের ক্যান্‌ভাসিংএর সময়, এ সময় উহা না হইলে ভাল হয়। তাই তিনি আমায় বলিলেন যে, যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ব্রাহ্মণের ১০০৲ টাকা দণ্ডই না হয়। তিনি আরও বলিলেন যে, এই সান্ধ্য সম্মিলন সাক্‌সেস্‌ করিতে হইলে যাহাতে কাউন্‌সিলাররা আসেন তাহার বিশেষ চেষ্টা যেন করা হয়, তা না হলে প্রায় কাউন্‌সিলার যোগ দিতে পারিবেন না। চেষ্টা করিলেই পারে কি না সন্দেহ। তিনি বলিলেন যে, কাজ (টাকা প্রাপ্তি) হইয়া যাইবে, তাহার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় যেন খুব ব্যগ্র না হন। তিনি আমাকে আজ এই জন্য এখন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে বলিয়া ক্যান্‌ভাসে বাহির হইয়া গেলেন। আমি মটর আনিতে বলিয়া খবর পাইলাম যে ড্রাইভারের খুব পেটের অসুখ হইয়া পড়িয়াছে, তাই এখন যাইতে পারিলাম না। চেষ্টা করিব বৈকালে দেখা করিবার। নলিনীকে বাড়ী বাড়ী পাঠান, অমূল্যবাবুকেও পাঠান; তাহাতে যদি ৯০ জনকে

হাজির করিতে পারেন। চীফ্‌কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তো, তাঁহাকে যেন নিমন্ত্রণে ভুল না হয়। অসুবিধা হয়েছে যে ঐ সোমবার আবার ঐ সময়ে বজেট কমিটির মিটিং। আর তারপর ইলেকসন সময়, কাউন্‌সিলারদের ঠিক সন্ধ্যাকালে যোগ দেওয়া কঠিন, ঐ সময়ই ক্যান্‌ভাসের বেষ্ট টাইম।

প্রণত

শ্রীগণপতি সরকার।

[এই পত্রের পৃষ্ঠে শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর লিখিয়াছিলেন]

আশীর্ব্বাদ জানিবে।

চীফ নিজে আমার নলিনীর ও অমূল্যর সাক্ষাতে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ দিন ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমি তোমার মেজদাদার সঙ্গে পরামর্শ করিবার সময় পাই নাই। আমি হীরেন বাবুকে ও নরেনকেও টাকা দিবার কথা বলিয়াছি। নলিনী ও অমূল্যকে বাড়ী বাড়ী যাইয়া নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছি। তুমি আমার এখানে না আসিয়া বৈকালে ৬টার সময় পরিষদে যাইও আমি সেখানে থাকিব। দরকার হইলে আমি নিজেও নিমন্ত্রণে যাইব।

শুভার্থী—

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

যাহা পরিষদ্ কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিতে পারেন নাই, যেখানে তাঁহারা ১৬০০০৲ পাইলেই অতিমাত্রায় কৃতার্থ হইতেন, সেখানে সেই পুরামাত্রায় ২৫০০০৲ টাকা পাইলেন। * ১৩৩৩ সালের ২৫শে ফাল্গুন যে

* এই কর্পোরেসনের গ্রাণ্ট সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার যে সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহা পরিশিষ্ট (ক)তে দ্রষ্টব্য।

দিন চেক্‌খানি পাওয়া গেল, সেদিন পরিষদ্ কার্য্যালয় গৃহে সমবেত কর্ত্তৃপক্ষের কি আনন্দ! চেক্‌খানি হীরেনবাবু, যতীনবাবু প্রমুখ কর্ত্তৃপক্ষ সকলেরই হাতে হাতে একবার ঘুরিল। পরিষৎ বিপদ মুক্ত হইল দেখিয়া সকলেই উৎফুল্ল। হীরেন বাবু আমাকে বলিলেন, এইজন্য আপনার দাদা বিধু বাবুকে অনেক কিছু করিতে হইয়াছে। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের আন্তরিকতার কথা কি বলিব। তিনি মেয়র ৺যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার (আমার মধ্যম ভ্রাতা), শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহা, এবং আমাকে একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া কৃতজ্ঞতা দেখান। এই খাওয়ানতেও অভিনবত্ব ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের যে যে বস্তু প্রিয় খাদ্য, যেখানের যে খাবার তাঁহার ভাল লাগে, তাহা পরিবেশন করা হইয়াছিল। ইহাতে নৈহাটীর গজা এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরের কারকাণ্ডাও বাদ পড়ে নাই। অধিকন্তু তিনি পরিষদের এক অধিবেশনেও বিধুবাবুর জন্য যে এই ঘোর বিপদ হইতে পরিষৎ মুক্তি পাইল তাহা স্বীকার করেন। আর "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" কি করিল? তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এই সুমহৎ কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, তাহাতে যাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় এত বড় কাজটি সম্পন্ন হইল, তাঁহাকে গাদায় ঠাসা হইল। এ প্রস্তাবে তাঁহার নামের সঙ্গে বহু লোকের নাম প্রধান কর্ম্মী বলিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। যাঁহার জন্য ১৬০০০৲ স্থানে ২৫০০০৲ হইল এবং যিনি মধ্যে কলকাটি না টিপিলে আদৌ কিছু মিলিত না, তাঁহাকে একটু বিশেষ ধন্যবাদ দিতে কিংবা একখানা পত্র লিখিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে পরিষদ্ পারিল না। আমাকে কিছু না বলায় আসে যায় না, কেননা আমি পরিষদের সভ্য এবং কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে একজন, পরন্তু শ্রীযুত বিধুভূষণ বাবু যিনি পরিষদের তখন সভ্যও নহেন অথচ ইহার জন্য এতটা করিলেন, তাঁহার প্রতি

পরিষদের সৌজন্যের এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইল না কি? অবশ্য বিধুবাবু আমার অনুরোধে এই কাজ করিয়াছিলেন, পরিষদ্ তাঁহাকে খাতির করিবে, কি করিবে না, তাহা তিনি আদৌ চিন্তার মধ্যে স্থান দেন নাই; তিনি চিরকালই অন্যের উপকার করিয়া আসিতেছেন, প্রত্যুপকারের আশা রাখিয়া কোন কাজ করেন না। বস্তুতঃ পরিষদে প্রকৃত গুণীর কদর কমই হয়। অবশ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এই অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় কিংবা হীরেনবাবু কেহই উপস্থিত ছিলেন না, থাকিলে এরূপ হইত না। বার্ষিক কার্য্যবিবরণে পরে ইহার একরূপ সংশোধন করা হয়। এই দান কর্পোরেসন্ হইতে বাহির করিবার ফলে, এখন অনেক লাইব্রেরী কর্পোরেসন্ হইতে "ক্যাপিটাল্ গ্রাণ্ট" পাইতেছে। ইহাতেই বিধুবাবুর কার্য্যের সার্থকতা হইয়াছে।

পরিষদের বিপদ এ সময়ে আরও ছিল। "রমেশ-ভবন" পরিষদের তখন অঙ্গীভূত না হইলেও, এবং তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে একটি স্বতন্ত্র পরিচালক-সঙ্ঘ থাকিলেও, উহা কার্য্যতঃ পরিষদেরই অঙ্গ ছিল। তাহাতে তখন পরিষদের চিত্রশালা স্থানান্তরিত হইয়াছে। অবশ্য পরিষদের চিত্রশালার জন্যই "রমেশভবনের" পরিকল্পনা। উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের" হস্তে উহা অর্পণ করাই একমাত্র অবশিষ্ট করণীয় কার্য্য পরিচালকসঙ্ঘের থাকে। "রমেশভবন" নির্ম্মিত হইলেও বারাণ্ডার কার্ণিস প্রভৃতির কাজ বাকি থাকে; কণ্ট্রাক্টার টাকা না পাইলে কাজ করিতে রাজি হয় না, অধিকন্তু টাকার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। তাহাদিগের অপরাধও ছিল না, কয়েক বৎসর তাহারা সহিয়াছিল। তাহাদের তখন ১০,০০০৲ টাকা পাওনা। যদিও শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড লিটন্‌কে পরিষদে আনিয়া পরিষদের ও রমেশভবনের দুর্দ্দশা দেখাইয়া ১৬০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট দিবেন স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন কিন্তু লর্ড লিটনের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি

চলিয়া যান। তাঁহার প্রতিশ্রুতির ফল পাওয়া সম্বন্ধে বড়ই গোল হইতে লাগিল। শেষ আশা একরূপ নিরাশায় দাঁড়াইল। যাহাই হউক কণ্ট্রাক্টার-গণকে টাকা না দিলেই নয়, সুতরাং ঐ কলিকাতা কর্পোরেসনের প্রদত্ত ২৫০০০৲ টাকার মধ্যে ১০০০০৲ টাকা "রমেশভবনে" ঋণ দেয়ানর ব্যবস্থা করাইয়া, ঐ টাকা কণ্ট্রাক্টারকে দেওয়া হইলে মান রক্ষা হইল, নতুবা নালিশ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। "রমেশভবনের" পরিচালকসঙ্ঘ অধিকাংশই পরিষদের লোক, সুতরাং "রমেশভবনের" নাম থাকিলেও পরিষদই মূলতঃ দায়ী ছিল। এখন এই টাকা দিবার পর "রমেশভবনের" পরিচালকসঙ্ঘ উহা পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুত ১৬০০০৲ টাকার আশা ছাড়েন নাই। তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিকট হাঁটাহাঁটির অন্ত ছিল না। তাঁহার এক মুসলমান ছাত্র বাঙ্গালার মন্ত্রী হইলে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার এই মন্ত্রী ছাত্রটির নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। লর্ড লিটন্‌কেও এজন্য বিলাতে পত্রের পর পত্র লিখিতে শাস্ত্রী মহাশয় ত্রুটি করেন নাই। শেষে লর্ড লিটন্ লজ্জায় তাঁহার পত্রের উত্তর দেন নাই। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম্-এ, বি-এল্, সি-আই-ই মহাশয়কে দিয়াও চেষ্টা করেন। যাহাই হউক অবশেষে শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ঐ ১৬০০০৲ টাকা বঙ্গীয় সরকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রদান করেন।

এই রমেশ-ভবনটি পরিষদের মিউজিয়ম্ বা চিত্রশালা। ইহার পুষ্টি, বৃদ্ধি ও পরিচালনার জন্য ২৪০০৲ টাকার বার্ষিক গ্রাণ্ট শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে আমার মেজদাদা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়কে বলিয়া "কলিকাতা কর্পোরেশন" হইতে করাই। অবশ্য ইহাতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাশ সহায়তা করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইল।

(পত্র সংখ্যা—১৭)।

April 19, 1929.

কল্যাণবরেষু

গণপতি বাবু, আপনার গুণে ত ঘাট নাই। আপনি প্রথম পোষ্ট কার্ড লিখেন তাহার পর চিঠি। দুইই পাইয়াছি। পাইয়া মনে খুব স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। আর তোমায় হাড়া ভাঙ্গিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। যদি এই গ্রাণ্ট বাৎসরিক হয় সাহিত্য পরিষদ চিরস্থায়ী হইবে। আর উহার মার নাই। তোমাদের হইতে সেবারকার পঁচিশ হাজার আর তোমাদের হইতেই এই মাসে দুশ টাকা।

আমি সেদিন মীটিং করিয়াই পরদিন প্রাতে বাড়ী আসিয়াছিলাম। একটু সরকারি কাজ সারিয়া কলসী উৎসর্গ করিয়াছি তাহার একদিন পরে মার শ্রাদ্ধ করিয়াছি। তাহারপর নাতিনীর বিবাহের উদ্যোগে আছি বিবাহ পরশু হইবে। বিবাহান্তে আগামী সপ্তাহে বোধ হয় ২৯শে এপ্রেল কলিকাতায় যাইব। ঐ দিন সোসাইটির একটা মীটিংএ যাওয়ার দরকার তাহারপর আর শীঘ্র বাড়ী আসিব না।

আমার আর যথা পূর্ব্বং তথা পরং। কিছুই বিশেষ হয় নাই বরং ডাক্তারের কথামত একটু বেশী হাঁটাহাঁটি করায় ব্যথা বাড়িয়াছে তোমার খবর দিও জ্বরভাব বোধ হয় এতদিনে সারিয়াছে আমি গিয়া তোমার শুক্রনীতি দেখিব জবাব দিতে দেরি হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না।

শুভার্থী—

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই গ্রাণ্টের দরখাস্ত আমার সহিত পরামর্শ করিয়াই করা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় ও পরিষদের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ ২০০০৲ টাকা পাইলেই খুসি হইতেন। শাস্ত্রী মহাশয় ২০০০৲ টাকার এক দরখাস্ত সহ এক পত্র আমায় পাঠাইয়া দেন সে পত্র ও দরখাস্ত এখানে উদ্ধৃত হইল। [পত্র সংখ্যা ১৫]

Mahamohopadhyaya
Dr. Haraprasad Shastri, M.A.C.I.E.
Honorary Member R.A.S. of London

26, Pataldanga Street,
Calcutta, February 14/1928

কল্যাণবরেষু,

গণপতি বাবু আমি তোমার নিকটই করপোরেসনের চিঠি পাঠাই তুমি পঁহুছাইয়া দিও তোমার মেজদাদার জন্যও একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাই তাঁহাকে দিয়া দিও। আমি আজ রাত্রে বাড়ী যাব।

শুভার্থী—
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

26, Pataldanga Street,
Calcutta, 14th. Feb., 1928

To

THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CALCUTTA CORPORATION.

Dear Sir,

The Library Committee of the Corporation has I hear given the Bangiya Sahitya Parishad the usual greant of Rs. 650/- this year also. This is very inadequate for a big institution like the Parishad. I therefore, pray that a special grant of Rs. 2000/- (two thousand) only be made annually. You know the Parishad is doing very good work and the reading room attached is largely used by the Public, the extensive cellection of Bengali Books, ancient and modern being its chief attraction.

I hope you will not disappoint us in this matter.

Yours Sincerely,
Haraprasad Shastri
President.
BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

এ ভাবে দরখাস্ত করিয়া সুবিধা হইবে না বলিয়া মেজদাদা পরিষদের অঙ্গ চিত্রশালারূপে রমেশভবনের নাম যুক্ত করিয়া এবং ২০০০৲ টাকার স্থলে ২৪০০৲ টাকা করিয়া যে ভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে বলিয়াদিলে, সেইরূপ দরখাস্ত করা হয়। ফলে ২৪০০৲ টাকাই ১৩৩৫ সালে মঞ্জুর হয় এবং ১৩৩৬ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথমবার পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, পরিষদ্ নিজের ভুলে শাস্ত্রী মহাশয়ের দেহান্তে এই গ্রাণ্ট হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

সন ১৩০৭ হইতে "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" নামে প্রাচীন বই ধারাবাহিক ছাপাইবার চেষ্টা পরিষৎ করে। শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক হন। তিনি ১৩০৯ সালে ইহার সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেন। তাঁহার সম্পাদনার সময়ে ছয় খানি পুস্তক এই তালিকায় বাহির হয়। তিনি পরিষদ্ হইতে (১) "বিদ্যাপতির পদাবলী," (অসম্পূর্ণ) ১৩০৭ সালে (২) ১৩১২ সালে মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গল," (৩) ১৩২৩ সালে "বৌদ্ধগান ও দোঁহা," (৪) ১৩৩৫ সালে "মহাভারত—আদি পর্ব্ব" সম্পাদন করেন।

তিনি বরোদার "মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-সম্মিলনে" ১৩১৬ সালে"; পঞ্জিকা-সংস্কার-বিষয়িণী সভায়" এবং কলিকাতায় "হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলনে" ১৩২৭ সালে; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মস্থান কাঁদীতে পান্থশালা-স্থাপনের সভায় সভাপতি হইয়াও ১৩৩০ সালের ৯ই বৈশাখে; আর পাটনার "ওরিয়েণ্টাল্ কন্‌ফারেন্সে" ১৩৩৫ পৌষ মাসে, পরিষদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন।

পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় তিনি লোকরঞ্জন বক্তৃতা (Popular lectures) ৯ নয়টি দিয়াছিলেন। কি কি বিষয়ে এই বক্তৃতা হইয়াছিল

তাহা লিখিত হইল—(১) বাঙ্গালার লিপিকথা (ছায়া চিত্র সহ) [দুইটি বক্তৃতা। ১মটি ১৩২৬ সালের ২৭শে চৈত্র ; অন্যটি ১৩২৭।১০ বৈশাখ]। (২) মহাদেব (১৩২৮।২৬ জ্যৈষ্ঠ)। (৩) ব্রাত্য কাহাকে বলে (১৩২৯।৪ কার্ত্তিক)। (৪) জয়দেব ও চণ্ডীদাস (১৩২৯।১৫ পৌষ)। (৫) বিদ্যাপতি (১৩৩০। ২৯ ভাদ্র)। (৬) বৌদ্ধধর্ম্ম [তিনটি বক্তৃতা—১মটি ১৩৩২।৬ চৈত্র ; ২য়টি ১৩৩২।১৩ চৈত্র এবং শেষটি ১৩৩৩।১৫ জ্যৈষ্ঠ]। এই মোট নয়টি।

পরিষদের বহু পুরস্কার-প্রবন্ধ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হইত। পুরাণগুলির মধ্য হইতে ইতিহাস খুজিয়া বাহির করিবার ইচ্ছায় পরিষৎ হইতে আমার পিতা ঠাকুরের নামে পঞ্চাশ টাকার পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করি। পরিষৎ তাহা স্বীকার করিয়া "স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিকতত্ত্ব" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য "গগনচন্দ্র পুরস্কার ৫০৲ টাকা" ঘোষণা করেন। ইহার পরীক্ষক শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন। এই পুরস্কার চালাইয়া যাইবার ইচ্ছা আমার ছিল কিন্তু পরীক্ষিত প্রবন্ধটি পরিষৎ কর্ত্তৃপক্ষ "পরিষৎ পত্রিকায়" ছাপিতে অস্বীকার করেন। প্রবন্ধ ছাপা না হইলে লোকের ব্যবহারে আসিল না, সুতরাং উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল না। যাহাতে উপকার নাই, তাহার জন্য অর্থের অপব্যয় করার আবশ্যক নাই বলিয়া ঐ পুরস্কার বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হই। পরিষদ্ শাস্ত্রী মহাশয়কে ১৩১৬ সালে তাহার বিশিষ্ট সদস্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয় দেয়।

পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য তাঁহার চেষ্টার সীমা ছিল না। তিনি অনেক দিন দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমার নিকট বলিয়াছেন যে, পরিচালকগণ তাঁহাকে দিয়া অনেক কিছু করাইয়া লইতে পারিত কিন্তু কিছুই করিল না। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে নিজের চেষ্টায় যতটা সম্ভব পরিষদের জন্য করিয়াছেন, পরিষদের সম্পাদক প্রভৃতি চেষ্টা করিলে আরও বহু কার্য্য তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন ইংরাজী-নবীশগণ কোনই ভাল কাজ করিতে পারেন নাই, একটি মাত্র

করিয়াছেন, সে কাজটি হইতেছে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ" স্থাপন।

তিনি পরিষৎ-স্থাপনকারীদিগের একজন না হইয়াও, পরিষদের জন্য যে যত্ন, যে পরিশ্রম, যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, আর কেহ তাহা করিতে পারিবে কি না জানি না। শুনিয়াছি রামেন্দ্র সুন্দরের মত পরিষদ্‌কে কেহ ভালবাসে নাই এবং ইহার প্রভূত কল্যাণ-সাধন তাঁহার সাহায্যেই হইয়াছে। অবশ্য পরিষদে যখন রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন তখন আমি ইহার কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম না। রামেন্দ্র সুন্দরের সহিত হরপ্রসাদের তুলনা হয় কি না বলিতে পারি না, কিন্তু হরপ্রসাদের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়াছি তাহা অকৃত্রিম, সরল এবং অতি উচ্চাঙ্গের। তিনি প্রাণ দিয়াই পরিষদকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার এই উদার অকলুষ অকৃত্রিম ভালবাসা না পাইলে পরিষদ্ আজ সমুজ্জলশিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না। এমন কি তিনি পরিষদের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট হইতে তাঁহার সংগৃহীত বৈষ্ণবীয় পুথিগুলি দান গ্রহণ করিয়া পরিষদের পুথি-শালাকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি যে উইল্ করিয়া যাইবেন, তাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও অংশ থাকিবে, একথা কয়েকবার আমায় বলিয়াছিলেন, কিন্তু হরপ্রসাদের এই শুভেচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তাঁহার উইলের পরিকল্পনা হইতেছিল, কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই তিনি হঠাৎ ধরাধাম ত্যাগ করিয়া যান। পরিষদের প্রতি তাঁহার অসীম মোহ ছিল। জানি না, তিনি যেরূপ পরিষদকে ভালবাসিয়াছিলেন, এরূপ একান্তভাবে আর কেহ পরিষদকে ভালবাসিতে পারিবে কি ?

প্রতিভা ঃ—

প্রত্নতাত্বিকদিগের মধ্যে হরপ্রসাদের স্থান অতি উচ্চে। বলিতে কি বাঙ্গালার প্রত্নতাত্বিকগণ তাঁহার ছাত্রস্থানীয়। ৺রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হাতে খড়ি তাঁহার নিকট। এ দেশের কেন, ভারতবর্ষের মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলালই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রত্নতাত্বিক। হর-

প্রসাদ তাঁহারই নিকট শিক্ষানবিশি করেন। প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক রূপে হরপ্রসাদের সমকক্ষ কেহই ভারতে ছিল না। তিনিই বৌদ্ধ পূর্ব্ব হিন্দুযুগের ইতিহাসের আদি প্রবর্ত্তক। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার নিকট শুনিয়া ও তাঁহার পুস্তকের খসড়া দেখিয়াই ভিন্‌সেণ্টস্মিথ্ নিজের ইতিহাসে হিন্দুযুগের কথা একটু বিশদরূপে লিখিয়াছিলেন। এজন্য শাস্ত্রীর নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করা কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। আর হরপ্রসাদ হিন্দুযুগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশী ও সুন্দর করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত লিখিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষায় তাঁহার পারদর্শিতা থাকায়, তদুপরি সমগ্র পুরাণ, উপনিষদ্, বেদ ও প্রায় ৪০০০০ হাজার পুথি দেখিবার সুবিধা ও সময় পাওয়ায়, তাঁহার হিন্দুযুগের বিষয় জানিবার বুঝিবার ও লিখিবার যে সুযোগ হইয়াছিল, তাহা আর কাহারও হইবার নহে। তাহারপর তিনি বহু শিলালিপি ও তাম্র-ফলকের পাঠ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভারত ঐতিহাসিকরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ভারতের বিষয় তিনি যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এরূপ অতি কম লোকই করিয়া থাকে। ইহার ফলে বৌদ্ধযুগ ও তৎপরবর্ত্তিযুগের ইতিহাস-জ্ঞান তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকায় এবং তিনি ভারতীয় হিন্দু তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ হওয়ায়, ভারতীয় ভাবধারা ও অবস্থা যেরূপ তাঁহার বুঝিবার সুবিধা হইয়াছিল, বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইলেও এ সুবিধা তাহাদিগের ছিল না, সেইজন্য হরপ্রসাদের ইতিহাস-জ্ঞানের সহিত তাহাদিগের তুলনা হয় না। আর বাঙ্গালার ইতিহাস তাঁহার মুখে যাহারা শুনিয়াছেন, তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালার ইতিহাসে তাঁহার কি গভীর জ্ঞান ছিল। দুঃখের বিষয় হইতেছে যে, এই অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার তাঁহার সহিতই লুপ্ত হইল। ইহা বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য, আর ভারতবাসীর অতিদুর্ভাগ্য।

কেন এমন হইল? তাহার নির্দ্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা দেশের পরম দুর্ভাগ্য যে তাহার সন্তানের মধ্যে অনেক মনীষী জন্মায়। যদি এ দেশে এ সময় বহুমনীষীর সমাবেশ না ঘটিত, তাহা হইলে এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিন্সিপল্ গিরীশচন্দ্র বসু, প্রিন্সিপল্ ক্ষুদিরাম বসু, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হরিনাথ দে প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতি সন্তানগণ যদি একযোগে একপ্রাণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন, তাহা হইলে দেশের গৌরব লক্ষগুণবৃদ্ধি পাইত এবং জগৎ অনেক নূতন তথ্য পাইতে পারিত। কিন্তু বঙ্গজননীর এমনই দুঃখের কপাল যে, তাঁহার জগৎবরেণ্য পুত্রগণের মধ্যে সে প্রীতি সে সদ্ভাব ছিল না; তাহার ফলে বাঙ্গালার যশ যতদূর বিস্তৃত হইবার কথা, তাহা হইল না। স্যর আশুতোষের সহিত হরপ্রসাদের পরবর্ত্তীকালে মনোমালিন্যের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পদ, হরপ্রসাদের না হইয়া, ডাঃ ডি, আর্ ভাণ্ডারকরের হইল। এই পদে হরপ্রসাদ বসিলে ভারত-ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাস তিনি দেশকে দিয়া যাইতে পারিতেন। হরপ্রসাদ তাঁহার এ আকাঙ্খা পরিপুরণের জন্য বৃদ্ধবয়সে সন্তান সন্ততি ত্যাগ করিয়া ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী গ্রহণ করেন কিন্তু ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা, দেশের কি দুর্দ্দৈব, তথায়ও চক্রান্ত করিয়া তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ করায়, তিনি বিরক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসেন। আমরা তাঁহাকে ভারতের বা বাঙ্গালার একখানি পূর্ণাবয়ব ইতিহাস লিখিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম এবং কথা উঠিলেই বলিতাম, তাহাতে তিনি কখন বলিতেন "কি হবে, দেশ চায় কই, পারি তো লিখবো"। সেই মনভঙ্গের জন্যই বিষম উদাসীনতা। হায় বাঙ্গালী জাতি, তুমি অভিশপ্ত, তাই তোমার

মধ্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক থাকিলেও তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা কর নাই।

বৌদ্ধধর্ম্ম, বিশেষ মহাযান সম্প্রদায় সম্বন্ধে হরপ্রসাদের জ্ঞান অতি গভীর ছিল। অনেকে এইজন্য তাঁহাকে বৌদ্ধ মনে করিত। ইংরাজিতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধাদি তো আছেই, তদ্ব্যতীত চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রিকায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞান যে কত সুগভীর ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। তিনি ডাঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের পুস্তকের জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটি অভিমত দিতেছিলেন, লাহা মহাশয়ের লোক আসিয়া তাহা লিখিয়া লইয়া যাইতেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি উহা লিখাইয়াছেন। বাঙ্গালায় যে অদ্যাপি বৌদ্ধধর্ম্ম লুক্কায়িত ভাবে হিন্দু-আকৃতিতে রহিয়াছে, তাহা তিনিই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম এত ভালরূপ বুঝিতেন যে, জাপান হইতে ছাত্ররা তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তক পড়িতে আসিত। তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়া মিঃ কিমুরা কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিল।

বৌদ্ধদের ন্যায়ের বই পাওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় ৬ ছয়খানি এইরূপ বই সংগ্রহ করিয়া একত্র ছাপাইয়াছিলেন। এ গ্রন্থের ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে খুব আদর হইয়াছে।

তন্ত্র শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। কাশ্মীর হইতে তাঁহার নিকট তন্ত্রাদি অনুশীলনের জন্য ছাত্র আসিত। মধুসূদন নামক একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া তন্ত্র পড়িতে দেখিয়াছি। তন্ত্রের বাহ্যিক প্রয়োগ তিনি তা ন্ত্রিকদিগের মত জানিতেন না বটে কিন্তু ঐ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান প্রচুর ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তন্ত্রের স্থান বড় কম নহে। সেই বৌদ্ধধর্ম্ম জানায় তাঁহার তন্ত্র বুঝিবার সুবিধা হইয়াছিল। নেপালে যাইয়া

তিনি হিন্দু-তন্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন ; আর হিন্দু ও বৌদ্ধের প্রকৃত প্রভেদ কোন স্থানে, তাহাও জানিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, নেপালে নূতন নূতন তন্ত্র এখনও লেখা হয়।

পুরাণের মধ্য হইতে তাঁহাকে অদ্ভুত উপায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধান বাহির করিতে দেখিয়াছি। সুপ্রাচীন বহু সংস্কৃত ব্যাকরণের নাম পাওয়া যায়। লোক চক্ষে সেগুলি লোপ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব ধীশক্তি, পুরাণের মধ্যে তাহাদের অনেকগুলির অস্তিত্ব যে বর্ত্তমান, তাহা ধরিয়া দিয়াছে। ছন্দ ও অন্য প্রাচীন পুস্তকের সন্ধানও তিনি পুরাণের মধ্যে পাইয়াছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তিনি আমাকে এক পত্র লিখেন, তখন আমি পুরীতে। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন——"·········একটা মস্ত খবর। আমার ৫ বছরের খাটা খাটুনি সব সার্থক হয়েছে। পুরাণের ডেট পেয়েছি ২শত শতাব্দী খৃষ্টের পূর্ব্বে। ব্রহ্ম পুরাণ তাই। আর ব্রহ্ম পুরাণ হোল আদি পুরাণ সুতরাং বাকী পুরাণ পরে পরে হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় এবং হইতেছেও তাই, পরে পরেই হইতেছে।"
[পরিশিষ্টে ১৩ সংখ্যা পত্র দ্রষ্টব্য।]

বেদের বিভাগ কিরূপে হইয়াছে, কোন দেশীয়েরা করিয়াছে, পাঞ্চালেরা কিরূপ করিয়াছে, এ সকল তিনি কত সুন্দর ভাবে প্রমাণ সহযোগে যে বুঝাইতেন, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করিবার নহে। এই সকল সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল প্রবন্ধ আছে, তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের ও সূক্ষ্ম দর্শনের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমার মনে হয় কাব্যশাস্ত্রে তাঁহার জোড়া ছিল না। ইহাতে কি গভীর জ্ঞান, কি অসাধারণ সূক্ষ্ম দর্শন, কি অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের শক্তি, কি অভিনব বুঝাইবার ক্ষমতা যে তাঁহাতে ছিল, তাহা তাঁহার সহিত যাহারা মিশিয়াছে তাহারাই জানে। তাঁহার "মেঘদূত ব্যাখ্যা" ও "নারায়ণে" কালিদাস সম্বন্ধে যে কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে

সাধারণে ইহার কতক উপলব্ধি করিতে পারিবে। আমি তাঁহার নিকট "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" বঙ্গদেশের সংস্করণ ও বোম্বাই আদি অঞ্চলের সংস্করণ মিলাইয়া পড়িয়াছি, এবং "মেঘদূত"ও পড়িয়াছি; দেখিয়াছি যে, কি অসাধারণ ভাবে তিনি কালিদাসকে বুঝিয়াছিলেন। পড়িবার সময় মনে হইত, বুঝি সত্যই কালিদাসের মানস প্রতিমা সব বুঝাইয়া দিতেছেন। কালিদাসের এত বড় নিষ্ঠাবান্ ছাত্র হরপ্রসাদের মত বুঝি আর কেহ জন্মায় নাই। মল্লিনাথ কালিদাসকে দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষের মূর্চ্ছা হইতে বাঁচাইয়া গিয়াছেন, আর হরপ্রসাদ কালিদাসকে হৃদয়ের সঙ্গে ভালবাসিয়া কালিদাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন কালিদাসকে বুঝিতে হইলে, ঘরে বসিয়া বুঝিতে পারিবে না। কালিদাসকে যদি বুঝিবে তবে কালিদাসের রঙ্গভূমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে শিক্ষা কর। কালিদাসকে বুঝিবার জন্য তিনি কালিদাসের বইগুলি সঙ্গের সাথী করিয়া সারা ভারত ঘুরিয়াছিলেন এবং কালিদাসের চিত্রপটগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছিলেন। কালিদাস যে প্রকৃতির উপাস্য সেবক ছিলেন, তিনিও তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন কেবল কালিদাসকে উপলব্ধি করিবার জন্য। কালিদাসের উপমা ও কালিদাসের বর্ণনার দ্বিতীয় নাই। প্রকৃতির কোন ফাঁকে কোন সৌন্দর্য্য বিকাশ হইয়াছে, কালিদাসের চোখে তাহা এড়ায় নাই; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপমাধুরী কালিদাসের হৃদয়রাজ্য বিভোর করিয়াছিল, তাই তাঁহার হাতে এমন মধুর কাব্য, এমন সুন্দর নাটক বাহির হইয়াছিল। স্বভাবের যেখানে যে শোভাটি অতুলনীয়, কালিদাস তাহাই নিখুতভাবে ধরিয়া দিয়াছেন। এমন যে অদ্বিতীয় শিল্পী, তাহাকেও চিনিতে হয়, তাহাকেও বুঝিতে হয়, আবার তাহার ফলান রং কিরূপ হইয়াছে তাহাও বুঝাইতে হয়, নতুবা অনেক স্থলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য সকলে বুঝিতে পারে না। হরপ্রসাদ চিনিয়াছিলেন কালিদাসকে, বুঝিয়াছিলেন প্রাণে প্রাণে, তাই বিভোর ছিলেন কালিদাসের ধ্যানে, তাই

পারিয়াছিলেন কালিদাসকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে। মধুভাণ্ডের এক স্থান ছিদ্র করিয়া দিলে মধু-ধারা যেমন অনর্গল বাহির হয়, দেখিয়াছি সেইরূপ হরপ্রসাদের কাছে একবার কালিদাসের কথা পাড়িলেই হইল, অমনি প্রস্রবণ ছুটিল, সে কি সুন্দর কি মধুর কি হৃদয়ানন্দকর, আর উঠিবার যো নাই। আবার বাঙ্গালার ইতিহাসের বা ভারতবর্ষের কোন স্থানের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহার নিকট একটু প্রসঙ্গ তুলিলেই হইল, অমনি অনর্গল সে বিষয়ের স্রোত বহিল, যতই কাজ থাক, সে কথা বসিয়া শুনিতেই হইবে। তাঁহার বিশ্বতোমুখী প্রতিভা তাহারাই বুঝিয়াছে যাহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছে। তাঁহার এক ক্ষমতা ছিল অত্যদ্ভুত, তিনি যেটি দেখিতেন, যেটি পড়িতেন, তাহাতে এমন ভাবে তলাইয়া যাইতেন যে, যখন তিনি সেই বিষয়টি বলিতেন, তখনই তাহার মূর্ত্তি নূতন হইত। এমন স্বচ্ছ ও সরলভাবে তিনি তাহা সম্মুখে ধরিতেন, যাহা দেখিলে সকলেই বুঝিত যে, সে বিষয়টি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন রহিয়াছে। এমনই ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের দিক্‌দর্শন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য তাঁহাকে কাব্যরাজ্য হইতে দূরে লইতে পারে নাই। তিনি যখন বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন ও ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহে ব্যস্ত, সেই সঙ্গেই কালিদাসের স্বভাব বর্ণনার ও উপমার বস্তুর রূপ-বিভঙ্গ দেখিতে ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছিল। এক কঙ্কেলি গাছ দেখিতে তিনি মধ্য ভারতের চম্বল প্রদেশে কয়েক ক্রোশ হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন। এই কঙ্কেলির কথা "ঋতুসংহারে" শরৎ বর্ণনায় কালিদা লিখিয়াছেন,—

শ্যামালতাঃ কুসুমভারনত-প্রবালাঃ
স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃত-ভূষণ-বাহু-কান্তিম্।
দন্তাবভাস-বিশদ-স্মিত-চন্দ্রকান্তিং
কঙ্কেলিপুষ্প-রুচিরা নবমালতী চ ॥১৮॥

শ্যামলতা কিসলয় ফুলভারে নত হয়,
ভূষিত ললনা-কর তার কান্তি হরে,
বিশদ-দশন-ভাস চন্দ্রকান্তি ধরে হাস,
কঙ্কেলি মালতী তারে শোভাহীন করে।

এই ঋতুসংহারের নূতন টীকার সহিত বাঙ্গালায় অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদ দিয়া আমি ঋতুসংহার ছাপাইয়াছিলাম। এই পুস্তক শাস্ত্রী মহাশয়কে উপহার দিই। কয়েকদিন পরে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার দেখা করিতে যাইলে তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার লেখা বেশ হয়েছে, তবে যে ভুল সকলে করে, তুমিও তাই করেছ।" ভুল হয়েছে শুনে, খুব উৎসুক ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভুলটা কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন "তুমিও কঙ্কেলিকে অশোক লিখেছ, কর্‌বেই বা কি, অভিধানগুলিতে যে উহার প্রতিবাক্য অশোক লিখেছে। দেখ, অশোক হয় লাল, তার পর উহা ফোটে বসন্তে, এই শরৎকালে অশোকের বর্ণনা হতে পারে কি, তার পর দাঁত, হাসি ও চাঁদ এগুলি সব শাদা, তার সঙ্গে লাল ফুলের কি করে তুলনা হবে, নবমালতী শাদা ওটা ঠিক আছে, সুতরাং কঙ্কেলি কখনও অশোক হতে পারে না, উহা শাদা ফুল।" কথাটা খুব খাটি। তারপর তিনি বলিয়াছিলেন যে, শরতে অশোক ফুল ফোটান, এবং শাদার সঙ্গে লালের উপমা হইতে পারে না দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়, তখন অনুসন্ধান করিতে করিতে, মালোয়ায় শুনিতে পান যে "কঙ্কেড়" বলিয়া শাদা ফুলের গাছ আছে, তখন তাহা দেখিতে যান, যাইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন হইল, অনুসন্ধান সফল হইল। কঙ্কেলি বেশ বড় গাছ, শাখা প্রশাখা আছে, ছোট লালচে গোল ধরণের পাতা, আর শাদা গোল গোল অজস্র ফুল ফোটে ; চম্বল প্রদেশের বনভূমিতে ইহার দৃশ্য বড়ই নয়নাভিরাম। কঙ্কেড় এবং কঙ্কেলি এক, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে "ল"কে "ড়"ও বলে। ব্যাকরণে তো

গোলই নাই। গাছ, ফুল ও ঋতু দেখিয়া তাঁহার আর সন্দেহের কোন অবসরই থাকে নাই। এইরূপ করিয়া তিনি কালিদাসের বর্ণনার বিষয় মিলাইয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যে বলিতেন, সারা ভারত ভাবুকের এবং কবির দৃষ্টি লইয়া যদি কেহ ঘুরিতে পারে, তবেই কালিদাসের রহস্য ও রূপমাধুরী তাহার চোখে ধরা পড়িবে। কথাটা যে কত বড় সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। "কুমার-সম্ভবে" হিমালয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন,—

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং
যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।
দরীগৃহদ্বার-বিলম্বিবিম্বা-
স্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥১।১৪॥

বসন হরণে আকুল লজ্জায়
কিন্নরীর কুল হইলে যথায়,
গুহাগৃহদ্বার সহসা তথায়
ঢেকে ফেলে মেঘ যবনিকা প্রায়।

হিমগিরির গুহার মুখ মেঘ ঢাকিয়া ফেলে, বোধ হয় যেন একটি পর্দ্দা সেখানে টাঙ্গান হইয়াছে। কালিদাসের এই বর্ণনা, প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত বুঝিয়া ওঠা কঠিন। মেঘ আবার আচ্ছাদন হয় কিরূপে! যাহারা সিমলা, মুশৌরী বা দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পাহাড়ে গিয়াছেন তাহাদিগের আর ইহা বুঝাইতে হইবে না, কেননা তাহারা এ বর্ণনা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। তাহারা দেখিয়াছেন, সময় সময় এই হিম-প্রদেশে এমন হয় যে, হঠাৎ সম্মুখে এরূপ কুয়াসা উঠিল যে, বিশ ত্রিশ হাত দূরের লোককে আর দেখা যায় না। এই কুয়াসা মেঘছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং একটি গুহার মুখে এক খণ্ড কুয়াসা জমে পর্দ্দা হইবে, তাহাতে বাহির

হইতে গুহার মধ্যে দেখা যাইবে না এরূপ হওয়া আদৌ বিস্ময়কর নয়; হিমপ্রধান হিমালয়ের ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এরূপ তো সর্ব্বত্রই ঘটে যে, সম্মুখে অদূরে মেঘ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, আবার কিছু সময় পরে মেঘ সরিয়া গেল, তখন পর্ব্বত ও গৃহাদি দেখা যাইতে লাগিল। এই হিমালয়ের মেঘের খেলা যাহারা দেখেন নাই, তাহাদিগের পক্ষে এরূপ বর্ণনা বুঝিবার কষ্ট হইবে, হয়তো ইহাকে উৎকট বর্ণনা বলিবেন, অথচ ইহা সেখানের অতি স্বাভাবিক দৃশ্য। কালিদাস "মেঘদূতের" একস্থানে বর্ণনা করিয়াছেন,—

রত্নচ্ছায়া-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥ পূর্ব্বমেঘ ১৫॥

ওই দেখ প্রিয়বর, ইন্দ্রধনু মনোহর,
বল্মীকাগ্র হতে কিবা উদিছে গগনে,
বিবিধ রত্নের ছায়া, শোভা ধরিয়াছে কায়া,
শ্যাম কলেবরে তব শোভিছে এক্ষণে;
গোকুলে যেন হে হরি, দিব্যরূপ পরিহরি,
কালরূপে আলো করি ত্রিভঙ্গ-মুরারি,
আভরণ করি তুচ্ছ, শিরে ময়ূরের পুচ্ছ,
শোভিতেছে বনমালী গোপী-মনোহারী॥

[পণ্ডিত ৺রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ]

বল্মীকাগ্র অর্থাৎ উইঢিবির সরু মুখ হইতে ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে বলিয়া মহাকবি কালিদাস এই যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ মল্লিনাথ ব্যতীত বহু টীকাকারই বুঝিতে পারেন নাই। মল্লিনাথও ঠিক বুঝিয়াছেন কি না তাহা সঠিক ধরিবার উপায় নাই, কেন না তিনি বল্মীকের

প্রতিবাক্য মাত্র দিয়াছেন, আর কোন মত প্রকাশ করেন নাই। সত্যই উইঢিবি হইতে ইন্দ্রধনুর উদয় শুনিলেই এক কিম্ভূতকিমাকার বোধ হয়। কিন্তু কবি সত্যই উহাতে কিছুমাত্র আজগুবি বা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার কবি-প্রাণে যে ভাব আসিয়াছিল, সেই টুকু মাত্রই তিনি লিখিয়াছিলেন। অনেক সময় এমন হয় যে, একটা দৃশ্য দেখা গেল এবং তাহা এক নূতন জাতীয়। তাহার বর্ণনা হুবহু করিলেও অনেকে সে ছবি ধারণায় আনিতে না পারিয়া, উহা বুঝিতে কিংবা বুঝাইতে নানাবিধ বিষয়ের অবতরণা করিয়া উহাকে আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলেন। এই দৃশ্যটিকে অনেক টীকাকার তাহাই করিয়াছেন—কেহ অভিধানের কচকচি, কেহ পুরাণের দোহাই, কেহ জ্যোতিষ এইরূপ প্রসঙ্গে কবির কবিত্বকে তলাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন দিন বৃষ্টির পর অথবা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিকালে সুবিস্তৃত মাঠের মধ্যে অবস্থান কালে কবি দেখিয়াছিলেন, ইন্দ্রধনু উঠিয়াছে, উহা অত্যন্ত নীচু হইতে উঠিয়াছে এবং অদূরে একটি উই ঢিবিও রহিয়াছে। ইন্দ্রধনুটি আকাশের গায়ে এত নীচু হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন উহা প্রায় মাটিতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; আর দূরস্থ উইঢিবিটি থাকায় দেখাইতেছিল যেন ঐ ধনুটি ঐ বল্মীকের চূড়া হইতেই উঠিতেছে। ইহা স্বাভাবিক ঘটনা, কোন কোন সময় এরূপ দৃশ্য দেখা যায়। প্রথম পড়িবার সময় এই দৃশ্যটির বিষয় আমারও গোলমাল বাধিয়াছিল; কিন্তু ১৩৪০ সালের ভাদ্র মাসে কাসিয়াং অবস্থান কালে, আমি ইন্দ্রধনুর যে দৃশ্য দেখি, তাহাতে কালিদাসের এই "বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ড-মাখণ্ডলস্য" বর্ণনাটি আমার নিকট অতি পরিষ্কার হইয়া যায়। আমি যে বাড়ীতে ছিলাম, তাহা পাহাড়ের খাড়াইএর ধারে, সুতরাং তাহার নীচেই খাদ্। ঐ খাদের গভীরতা ৩০০ ফুটের বেশী বই কম নয়, আর ঐ খাদটি সুবিস্তৃত, এপার হইতে ওপারের সীমানায় পৌছিতে অন্তত ৫।৭ মিনিট

লাগে। উহার মধ্যে উপরের পাহাড় হইতে একটি ঝরণার প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। এই খাদের চারিদিকেই পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। একদিন অল্প বৃষ্টির পর দেখি যে, একখণ্ড ইন্দ্রধনু ঐ খাদের মধ্যেই উঠিয়াছে এবং তাহা পাহাড়টি জুড়িয়া আছে, উপরের আকাশের সহিত তার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, আর উহা এমনই ঝুলিয়া পড়িয়াছে যেন ঐ ঝরণার জল ছুইয়াছে। আমার মনে হইল যেন পাহাড়ের গায়ে তুলি দিয়া চিত্রকর অপূর্ব্ব রঙে একখানি ধনু আঁকিয়া দিয়াছে; আর তখনি কালিদাসের এই বর্ণনা মনে পড়িয়া গেল। যদি জলস্পর্শ করিয়া ধনু এখানে উঠিতে পারে, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এইরূপ নীচু হইতে ইন্দ্রধনুর উঠা দেখিয়াই মহাকবির এই অপূর্ব্ব বর্ণনার অবতারণা। শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার এই অভিজ্ঞতা বলিতে পারিলে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তখন তিনি পরপারে। কালিদাসকে বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে ভালবাসিয়া তাহারই প্রেমে মুগ্ধ পর্য্যটক হইতে হইবে বলিয়া হরপ্রসাদ যে কথা বলিতেন, তাহা অতীব সত্য।

হরপ্রসাদ যেমন রসজ্ঞ তেমনি সুরসিক ছিলেন। এইজন্য তিনি নিরসের মধ্যেও রসের সঞ্চার করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার শক্তি কত অদ্ভুত তাহার একটি প্রসঙ্গ পাড়িতেছি। একবার পুরীর মন্দিরের শিলালিপির প্রতিলিপি লইতে আমি তাঁহার সহিত পুরী যাই। সে সন ১৩৩৪ এর জ্যৈষ্ঠ। তখন তাঁহার বড়জামাতা শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন চট্টোপাধ্যায় পুরীর ম্যাজিষ্ট্রেট্। তাঁহার বাসাতেই আমরা উঠি। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে "রঘুবংশ" সঙ্গে লইতে বলিয়াছিলেন। একদিন আহারের পর মধ্যাহ্নে বিছানায় শুইয়া বলিলেন "রঘুবংশ" এনেছ ত, রঘুর দিগ্‌বিজয় পড়। আমি বলিলাম ঐ নিরস অংশে পড়ার কি আছে। তিনি বলিলেন পড়ই না। পড়িতে লাগিলাম, আর তিনি ব্যাখ্যা করিয়া

যাইতে লাগিলেন। ঐ নিরস সর্গটি তিনি এমন সরসভাবে ব্যাখ্যা করিলেন এবং প্রাচীন ভারতের মানচিত্র যেন নখদর্পণে ধরিয়া দিলেন। তখন ঐ সর্গে কালিদাসের কারিকুরি কতখানি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। জানা বিষয় যে অত ভাললাগিবে এবং তাহার মধ্যে নূতন কিছু পাইব তাহা ভাবি নাই কিন্তু যখন আমাদিগের ঐ সর্গ শেষ হইল, দেখিলাম আমি কত বেশী শিখিয়াছি। যে দেশের কথা কবি বলিতেছেন, সেই দেশের বিশিষ্টতা নির্দ্দেশ সম্পর্কে কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে, ইতিহাসের সংমিশ্রণে তাহার বিশ্লেষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের সে ব্যাখ্যা যে কি অপূর্ব্বই হইয়াছিল তাহা জীবনে ভুলিবার নয়। তাঁহার কাছে নিরসও সরস হইত, তাঁহার কাব্যে অদ্ভুত প্রতিভা ছিল। সুরসিক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একবারে তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "লোকটাকে বড় বড় কাজ কর্ম্মের খাতিরে গম্ভীর বন্‌তে হয়েছে কিন্তু বাবা আমরা তো বুঝি, প্রাণটা যে ছেব্‌লা, সেটা ছট্‌ফট্‌ করে মরছে, একটু ঠোকোর দাও না, রসে টৈটুম্বুর হয়ে আছে, দেখবে কেমন স্রোত গড়াবে।" সুগভীর পাণ্ডিত্য, আশ্চর্য্য মেধা, সারসংগ্রহে তীক্ষ্ণ শক্তি, এবং অপূর্ব্ব বিন্যাস (Exposition) শক্তির সমবায়ে তাঁহার সুরসিক প্রাণের এক অপরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল। যাহার ফলে তাঁহার লেখায় রসমাধুর্য্য অপ্রতুল থাকিত। তাঁহার বাঙ্গালা লেখা সংস্কৃত বহুল পণ্ডিতি বাঙ্গলা নয় কিংবা গ্রাম্য-ভাষাদুষ্ট বাঙ্গালা নয়, শাদা কথায় তাঁহার ভাষা পোষাকী বা আট্‌পৌরে নয়, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া বুদ্ধদেবের মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ, তিনি যেন এই ভাষাতে মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা দুইদিক বজায় রাখিয়া খাঁটি বাঙ্গালাই হইয়াছে; সংস্কৃতানুসারীও হয় নাই বা চল্‌তি ভাষাও হয় নাই। তাঁহার ভাষা স্বচ্ছ সরল অনাবিল এবং অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ ধরিতে হইলে তাঁহার ভাষাই প্রধানতঃ উপযোগী।

মানুষ হিসাবে হরপ্রসাদের প্রাণ উদার ও অমায়িক ছিল। পরের দুঃখে তিনি অভিভূত হইতেন। তাঁহার ব্যবহারে বিনয় ভদ্রতা শিখিবার ছিল। প্রকৃতি তাঁহার এতই মধুর ছিল যে, যে তাঁহার সহিত ব্যবহারে আসিয়াছে সেই তাঁহার মুগ্ধভক্ত বা সুহৃদ্ হইয়াছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। যে তাঁহার সহিত পরম শত্রুতা করিয়াছে, দেখিয়াছি সে ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি শত্রুতা ভুলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তাহার পরমকল্যাণ হয় তাহাই করিয়াছেন, তাহা করিতে শারীরিক পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। নাম বলিতে চাহি না, যিনি তাঁহার (শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষাতেই এই কথাটা বলি) father's ending (বাপান্ত) করিয়াছেন, তিনি সেই লোককে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল করিয়া দিয়াছেন। হরপ্রসাদের হৃদয় অতি কোমল ছিল। তাঁহাকে সাহসে ভর করিয়া বলিতে পারিলেই তিনি তাহার জন্য ব্যস্ত হইতেনই। তাঁহার গুণে পর আপন হইয়া যাইত। তাঁহার অমায়িক ভাব, সর্ব্বদানে সদয় ব্যবহার, নিরভিমান অগাধ পাণ্ডিত্য, অকপটে উত্তর প্রদান, বন্ধুবাৎসল্য, কর্ম্মীদিগের প্রতি স্নেহ, কার্য্যে উৎসাহ প্রদান, অসাধারণ সৌজন্য, সামাজিকতা, ভদ্রতা ও ক্ষমা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণাবলী লোককে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। দেখিয়াছি যিনি একবার তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার ব্যবহারে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সুখ্যাতি না করিয়া পারেন নাই। সত্যই এককথায় তিনি মাটির মানুষ ছিলেন। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" বিদ্বান্ যে বিনয়ী হয়, তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহাতে দেখিয়াছি। তাঁহার ন্যায় সদালাপী ও সুরসিক লোক কদাচ দেখা যায়। সরলতা তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। পণ্ডিত হইলেও তাঁহার যে বৈষয়িক বুদ্ধি আদৌ ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তিনি কূট বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি নির্ম্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। এ সম্পর্কে

এক কৌতুকের কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি নৈহাটীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। একবার তিনি ও তাঁহার একজন সঙ্গী দুইজনে বিচার করিতেছেন। কি একটা মকদ্দমা ঠিক মনে নাই, বোধ হয় "খোরাকীর মামলা"। একটি নৈহাটীর বেশ্যা সাক্ষী দিতে দিতে, অনেকগুলি ভদ্রলোকের নামে অমুক অমুকের রক্ষিতা ইত্যাদি রূপ কুৎসা করে। তাহাতে হরপ্রসাদ তাহাকে বলেন যে, 'কেন ভদ্রলোকের নামে এরূপ অকথা বলিতেছ'। তাহাতে সেই বেশ্যা উত্তর করে, "সে সত্য কথাই বলিতেছে"। তাহাতে তিনি একটু রুষ্ট হইয়া বলেন যে, তাঁহার নামে সে কিছু বলিতে পারে। তখন সেই বেশ্যা বলেছিল—"আপনার কে আছে তা বাবু আমি না হয় জানি না, কিন্তু আপনার যে কেউ নেই একথা বলা যায় না।' তাহাতে তাহার সঙ্গী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ্যাদিগকে এরূপ বলতে আছে, যদি কাহারও নাম করত তা হলে কথাটা কত লজ্জার হতো।" তাহার উত্তরে শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, "এখন দেখছি তা হতো বটে, তবে নেইতো ও বলবে কোথা থেকে।" অবশ্য তিনি স্বীকার করিলেন এরূপ সাহস করাটা ভাল হয় নাই।

হরপ্রসাদের নিকট যাহারা কাজ করিয়াছে, তাহাদিগের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। পণ্ডিত ৺আশুতোষ তর্কতীর্থ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। গবর্নমেণ্টের সংগৃহীত এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে রক্ষিত পুথিগুলির যে সবিবরণ পুস্তকতালিকা তাহার অধীনে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে আশুপণ্ডিত মহাশয় বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তর্কতীর্থ মহাশয় এ কাজে নিপুণ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ছিল। যেমন নিরহঙ্কার ছিলেন, তেমনি নির্লোভ ছিলেন। আবার তাহার গোড়ামী আদৌ ছিল না, অথচ হিন্দুয়ানী ও ধর্ম্মে আস্থা ষোল আনা ছিল। এই সকল সদ্গুণের জন্য তাঁহাকে হরপ্রসাদ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আশুপণ্ডিত না হইলে, হরপ্রসাদের পিতামাতার বার্ষিক

শ্রাদ্ধই বল বা নিজের জন্মতিথি পূজাই বল, হইত না। শাস্ত্রীমহাশয়ের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট তর্কতীর্থ মহাশয়কে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিবেন স্থির হইয়া যায়। নাম বাহির হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বেই হঠাৎ অসুস্থ হইয়া তর্কতীর্থ মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার এই অসুখের সংবাদ আমি বা শাস্ত্রী মহাশয় পাই নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুতে শাস্ত্রীমহাশয় অতিমাত্র শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর, যে দিন তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়, তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহু কথাই বলিলেন, অবশ্য এখানে তাহা অনাবশ্যক। তবে এই দুঃখই শাস্ত্রীমহাশয়ের আরও বেশী হইয়াছিল যে, মহামহোপাধ্যায় উপাধি-প্রাপ্তি-সংবাদ পণ্ডিত মহাশয় শুনিয়া যাইতে পারিলেন না। শাস্ত্রী মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী ও পুত্রের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতেও কিছু মোটা টাকা পাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্য এইরূপ অপার ছিল।

হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার শক্তি আমার নাই। এই মাত্র বলিতে পারি, যে শাস্ত্র তিনি দেখিতেন তাহার মধ্য হইতে অদ্ভুত শক্তিতে সারসংগ্রহ করিতে পারিতেন এবং তাহা এমন সুন্দররূপে পরিবেষণ করিতেন যে, সে শাস্ত্র যতই সুকঠিন হউক না কেন, তাহা তখন হইয়াছে অতি সরল, সুপাঠ্য, সুদর্শন ও সহজগম্য। এই শক্তি অতি বিরল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। ঘটনার সাল তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি-পথে জাজ্জ্বল্যমান থাকিত, ঘটনার বিষয়ের তো কথাই নাই। বিষয়টি অবতারণ করিবার, বলিবার ও বুঝাইবার শক্তি তাঁহার অপরিসীম ছিল। কোন শাস্ত্র যে তিনি জানিতেন না, তাহা জানি না, সকল শাস্ত্রই তো আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। অবশ্য টুলো পণ্ডিতেরা বলিতেন বটে যে, তাঁহার শাস্ত্রের গভীরতা নাই। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে তো সকলেই নির্ব্বাক থাকিতেন। সংস্কৃত ভাষাতে তিনি বক্তৃতা করিতেও পারিতেন। পুরীর

মন্দিরে মুক্তিমণ্ডপ নামে একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও লাইব্রেরী হইয়াছিল। তিনি ও আমি যখন পুরী গিয়াছিলাম, তখন উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ জীবিত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে সেই চতুষ্পাঠী ও লাইব্রেরী দেখাইতে লইয়া যান এবং পরে ঐখানে শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন প্রদান করেন। সেই সভায় স্যর্ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও ছিলেন। সেখানে স্যর দেবপ্রসাদ ও শাস্ত্রী মহাশয় উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশ্য সে বক্তৃতা বাগ্মীদিগের ন্যায় হয় নাই, হওয়া সম্ভবপরও নয়। অবশ্য তিনি কোন ভাষাতেই বাগ্মী আখ্যা পান নাই, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতব্য হইত।

শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জগৎ জুড়িয়াই ছিল। যতটা মনে হইতেছে তাহাতে, তাঁহার ঢাকার চাকরি লইবার পূর্ব্বে, বিলাতের অক্সফোর্ড (কি কেম্‌ব্রিজ্) ইউনিভার্‌সিটি তাঁহাকে সংস্কৃতের বক্তা (Sanskrit Lecturer) হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল। বোধ হয় তাঁহার সেখানে একবার যাইবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। কেন না, তাঁহার সহিত এ সম্পর্কে কথা হওয়ায় তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসীর তো জাতের ভয় নাই, যাইলে সন্ন্যাস লইলেই হইল। আরও তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি যাঁহারা অধিক বয়সে বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই আর দেশে ফিরিতে পারেন নাই, সেখানেই দেহ রাখিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে এই বিপদ্ আছে। তিনি আর বিলাতে যান নাই।

সমাজ-সংস্কার ঃ—

হরপ্রসাদ প্রথম বয়সে একবার সমাজ-সংস্করণ করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দেশের একজন বৈদ্য বিলাত গিয়াছিলেন। (তিনি বৈদ্যটির নাম বলিয়াছিলেন কিন্তু আমি ভুলিয়া গিয়াছি।) তিনি ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বসমাজে উঠিবার জন্য হরপ্রসাদের শরণাপন্ন হন। হরপ্রসাদ বুঝিলেন যেরূপ দেশকাল পড়িয়াছে তাহাতে বিলাত

ঘরবাড়ী হইবে, সুতরাং বিলাতফেরতদের সমাজে না লইলে সমাজের ক্ষতি অনিবার্য্য। তিনি বৈদ্যটির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই কার্য্যের পর দেশে তাঁহাকে নির্য্যাতিত হইতে হয়। ইহার পর রিজ্‌লি সাহেবের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে সমাজে ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরেই কায়স্থদের যে স্থান ছিল, তাহা হইতে ভ্রষ্ট করিবার বন্দোবস্ত হওয়ায়, ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রক্ষার্থ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন উঠে। তাহাতে কায়স্থ-নেতাগণ তাহাকে এই আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভার প্রদান করেন। তিনি তাহা গ্রহণ করেন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দুই তিন মাস পীড়িত থাকেন। প্রথম সাব্যস্ত হয় তিনি আরোগ্যলাভ করিলে উপনয়ন-গ্রহণাদির ব্যবস্থা হইবে কিন্তু তাঁহার আরোগ্য-লাভে বিলম্ব হইতে থাকায়, উৎসাহ-ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় ৺চণ্ডীচরণ স্মৃতিরত্ন (পরে মহামহোপাধ্যায়) মহাশয়ের সহায়তায় ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থা ও উপনয়নগ্রহণাদি করান। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় সুযোগ্য লোকের হস্তে একাজ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল, তাহা না হওয়ায় কার্য্যের কিছু বিশৃঙ্খলা হয়, ফলে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগ দিলেন না; এজন্য এই কার্য্যে একদল বিরোধী রহিয়া গেল। শাস্ত্রী মহাশয় আমায় বলিয়াছিলেন, এইরূপ দুই দুই বার হওয়ায় তিনি আর সমাজ-সংস্কার করিতে যান নাই। তাঁহাকে দিয়া এ কাজ করান হয় নাই বলিয়া তিনি উপবীতী কায়স্থদিগকে কখন অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। নগেনবাবুকে তিনি যথেষ্ট প্রীতি ও ভাল-বাসার চক্ষে দেখিতেন। নগেন্দ্রবাবু অসুস্থতার জন্য ইদানী বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতে যাইতেন, কোন কোন দিন আমিও সঙ্গে গিয়াছি। নগেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ীতেই। আমিও উপবীতী কায়স্থ; পুরীতে শাস্ত্রী মহাশয়ের জামাতা-বাড়ীতে এক স্থানেই বসিয়া তাঁহাদিগের সহিত

আমি অন্নাহারও করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় সদাশিব পণ্ডিত যেদিন নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, সেদিনও তিনি পণ্ডিতজীর সঙ্গে এক গৃহে বসিয়াই আমার সহিত একস্থানেই আহার করিয়াছিলেন। তিনি কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং জানাও ছিল। তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গোঁড়ামী ছিল না। তিনি বলিতেন, তিনি ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নন।

ধর্ম্মে আস্থাঃ—

হরপ্রসাদ ইংরাজী শিক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুয়ানী ছাড়েন নাই। তিনি সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। প্রতি বর্ষে নিজের জন্মতিথি পূজা করিতেন। পিতা মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতেন। নৈহাটির সুপ্রসিদ্ধ তারক সরকার মহাশয়ের স্ত্রী গঙ্গার ঘাট বাঁধাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এ কার্য্য তাঁহাকে দাঁড়াইয়া করাইতে হয়। তিনি হিন্দুদিগের নিষ্ঠা আচার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতারা আচারবান্ ছিলেন না। একদিন তাঁহারও আচার ভঙ্গ হয়, তজ্জন্য তাঁহার জননী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভরসা ছিল যে, মৃত্যুকালে একজনও আচারবান্ পুত্রের হাতের জলপান করিয়া পবিত্রভাবে মরিতে পারিবেন কিন্তু তাঁহার সে আশা গেল। তদবধি হরপ্রসাদ আর কখন হিন্দুর আচার ত্যাগ করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার নিজের বিশ্বাস থাকুক বা নাই থাকুক কিন্তু পিতামাতার যখন বিশ্বাস ছিল, এই কাজ করিলে তাঁহাদিগের আত্মার তৃপ্তি ও সদ্গতি হইবে, তখন পুত্রের কর্ত্তব্য হিসাবে তাঁহাদিগের বিশ্বাসের জন্য, তাঁহারা যাহা চাইতেন, সেইরূপ নিষ্ঠা আচার রাখিয়া সেই সকল কাজ করিতে তিনি বাধ্য। পিতামাতার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি কতখানি গভীর ছিল, তাহা ইহাতেই প্রকাশ এই আচার রাখিবার জন্যই তিনি কোন স্থানে কিছু খাইতেন না।

ইহাতে তিনি একবার বড় বিপন্ন হইয়াছিলেন। সে বেশ এক মজার কথা। একবার প্রথম বয়সে তিনি বাঁশের ঝাড় কিনিয়াছিলেন। তাহা তিনি নিমতলার এক বসু বংশীয় কায়স্থ কাষ্ঠব্যবসায়ীকে বিক্রয় করেন। ইহার কয়েকদিন পরে একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া গামছা হাতে বসুজার নিকট টাকার তাগাদায় যান। বসুজা তাঁহাকে জলপানের জন্য সন্দেশ আনিয়া দিলে, তিনি খাইবেন না বলেন। তাহাতে বসুজা অত্যন্ত চটিয়া যাইয়া বলেন যে, "আপনি আমার বাড়ীতে খাইবেন না কেন? আমি কুলীন কায়স্থ, এমন কোন ব্রাহ্মণ আছে যে কায়স্থের বাড়ী, বিশেষ কুলীন কায়স্থের বাড়ী খায় না, আপনি বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার গুরু বংশীয় হইতেছেন, সুতরাং আপনাকে খাওয়াইতে আমার অধিকার আছে, অতএব আপনি না খাইলে সেই অধিকার বলে আপনাকে জুতা মেরে খাওয়াইতে পারি।" অবশ্য ইহার পর আর কথা না বলিয়া হরপ্রসাদ সেই মিষ্টান্ন সেবন করিয়াছিলেন। তখন বসুজা অতি ভক্তির সহিত প্রণামাদি করিয়া উপযুক্ত প্রণামী ও প্রাপ্য টাকা দিয়া তাঁহাকে বিদায় করেন। এই গল্প তিনি খুব হাসির সহিত বলিয়াছিলেন।

পরীক্ষক :—

তাঁহার কর্ম্ম সম্পর্কে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত যে বিবৃতি আছে, তাহাতে পাই যে, তিনি এম্,এ পরীক্ষার দুই বৎসর মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক, চার বৎসর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক এবং বহু বৎসর কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক ছিলেন; কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পি-আর্-এস্, পি-এইচ-ডি এবং Research Prize Essays সম্পর্কে ভারতীয় বিষয়ের পরীক্ষা তাঁহাকেই করিতে হইত। একবার হিন্দি ও একবার সংস্কৃত বিষয়ে Honours পরীক্ষায় Board of Examiner গণ তাঁহাকে দুইবার পরীক্ষক নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার পরও

তাঁহাকে ঐ সকল ও অন্যান্য ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক হইতে ও পরীক্ষাপত্র স্থির করিয়া দিতে দেখিয়াছি।

আবিষ্কার ঃ—

বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ বৌদ্ধধর্ম্ম মানিয়া আসিতেছে, অথচ তাহারা জানে না যে, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম মানিতেছে। ঐ বৌদ্ধধর্ম্ম এখন হিন্দুয়ানীর অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মঠাকুর পূজা ও উহার পূজক হিন্দুদিগের নীচশ্রেণীর লোক এবং ঐ পূজার মন্ত্রাদি, এগুলি বৌদ্ধভাব সম্বলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম যে আজও বাঙ্গালায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে, এইটি আবিষ্কার শাস্ত্রী ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে করিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দেন। ভারতবর্ষে ও ইউরোপে তাহার এই আবিষ্কারের খুব সমাদর হইয়াছিল।

রাজপুতনার মরুভূমির একাংশে আজও অগ্নির উপাসক জোরোয়াষ্টার (পারসীক) ধর্ম্মাবলম্বী রহিয়াছে। ইহাও তাঁহার অন্যতম আবিষ্কার।

মৌর্য্য-রাজত্ব-ধ্বংশকারী শুঙ্গরা সামবেদী ব্রাহ্মণ। শুঙ্গ শব্দটী গোত্র-বাচক। শুঙ্গ-গোত্রীয় অনেক প্রথিতনামা সামবেদী পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারও আবিষ্কারক শাস্ত্রী।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে বাল্‌খ পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত রাজ্য ছিল। তাহার রাজধানীর নাম পুষ্করণ (Pushkarana)। ইহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।

The Eleventh Volumes of the Notices of Sanskrit Manuscripts পুস্তকে তিনি সকলকে প্রথম জানান যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ১০ম ও ১১শ শতকে বাঙ্গালায় বেশ বড় বৌদ্ধসাহিত্যের অস্তিত্ব তিনি বাহির করেন। তিনি আরও বাহির করেন যে, বৌদ্ধদের বহু সংস্কৃত পুস্তক ছিল, তাহার মূলগুলি আর সংস্কৃতে দেখা যায় না, কিন্তু তিব্বতী ভাষায় বা চীন ভাষায় সেগুলির

অনুবাদ রহিয়াছে। তিনি হিন্দুদিগেরও অনেক লুপ্ত প্রায় সংস্কৃত পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন। বাঙ্গালায় বিষ্ণুপুরের গোল তাস ও তাহার খেলা ছিল, তাহা প্রকাশ করেন। তাস-খেলার-উৎপত্তি যে ভারতে, তাহার তিনিই আবিষ্কারক।

সভাপতিত্ব ও অভিভাষণঃ—

তিনি বহু স্থানে বহু অভিভাষণ দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তো বহু অভিভাষণই দিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিভাষণে প্রাচীন বৌদ্ধ-বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণ দেন। ইহা তৎকালে অজানিত ছিল। আর তৃতীয় অভিভাষণে নাগার্জ্জুন হইতে অভ্যাকর গুপ্ত পর্য্যন্ত (২য় হইতে ১২শ শতক) উত্তর ভারতের সংস্কৃত-বৌদ্ধ-সাহিত্যের ইতিহাস দিয়াছিলেন। রংপুরের মিউজিয়ম্ উদ্বোধনে তিনি ভারতের সমস্ত Archeological Museumএর বিষয়ে অভিভাষণ দেন। কাশীর হিন্দু ইউনিভারসিটি খুলিবার সময় তিনি ইংরাজীতে Educative influence of Sanskrit (শিক্ষায় সংস্কৃতের প্রভাব) সম্বন্ধে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া Sir Harcourt Butler লিখিয়াছিলেন—

GOVERNMENT HOUSE,
RANGOON,
Dated 31st. March, 1916.

My dear Sir,

Thank you very much for your interesting lecture on the educative influence of Sanskrit. I have read it with greatest interest and if you will allow me to say so, I think it does justice to your reputation as a scholar. My interest in orientalia does not grow less and I hope to do something for Pali later

on. I have new problems and new people to deal with here but I don't forget my old Indian friends.

With all good wishes.

Yours Sincerely,
HARCOURT BUTTLER.

মথুরার All India Sanskrit Congress এর সভাপতিরূপে তিনি সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত-সাহিত্য কত বড় তৎসম্বন্ধে অভিভাষণ দিয়াছিলেন। কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে সমগ্র বাঙ্গালা-সাহিত্যের উপর এবং কলিকাতা ও ২৪ পরগণার সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অভিভাষণ দেন। আবার বর্দ্ধমানে ঐ সম্মিলনের সভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি রূপে, যে দুই অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালার গৌরবের যা কিছু সমুদয় দেখাইয়াছিলেন। "এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গলে" দুই বৎসর সভাপতিরূপে দুইটি অতি মূল্যবান অভিভাষণ দেন। তিনি অনেক স্থানে অনেক অভিভাষণ দিয়াছেন এবং কত স্থানে সে সভাপতি হইয়াছেন, সমস্ত খুটি নাটি করিয়া বলা কঠিন। তিনি আমাদের "বেলেঘাটা লাইব্রেরীর" দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ১৩২৭ সালে সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যে, ইতিহাসে ও সংস্কৃত-সাহিত্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের দান বড় যে সে নয়। সে সম্বন্ধে তাঁহার মুদ্রিত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বিবৃতি হইতে উদ্ধৃত হইল।

বাঙ্গালা সম্পর্কে ঃ—

"The Shastri's first contribution to the History of Bengali Literature, is a long paper in the Bangadarsan entitled, The Bengali Literature of the present (19th) Century—a paper which is still read and criticised.

The second contribution is a pamphlet in English entitled the "Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education" in 1891, which gave for the first time an insight into the richness of the Vaisnava Literature of Bengal. This work gave an impetus to the search of Manuscripts of Bengali Literature to which Bengal owes the works of Babu Dinesh Chandra Sen and Babu Nagendra Nath Basu.

The third contribution is to be found in the Eleventh Volume of the Notices of Sanskrit Manuscripts, a part of the introduction of which is devoted to it. In this the Shastri for the first time informed the public that Bengali literature owed its origin to Buddhism. [একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ।]

His last work on the subject is, Bengali Buddhist songs, thousand years old, which has just been published. It has taken the History of Bengali Literature, five or six centuries back. These songs and Dohas have all been discovered, studied and edited by the Shastri single-handed and the edition is accompanied by an all-word index with meanings and an author-index of Buddhist writers in Eastern India taken from the Tantra Section of the Tibetan Tangur." [এই বৌদ্ধগান ও দোঁহার কথাও বলা হইয়াছে]।

সংস্কৃত সম্পর্কেঃ—

"The Shastri has published the Svayambhu Purana, the only Buddhist Purana, ever written. It is a history of Nepalese Buddhism giving also a detailed topography of all holy places in that country

specially of the Svayambhu Kshetra, the greatest place of pilgrimage of the Northern Buddhists.

The six tracts of Buddhist Nyaya are unique works on Buddhist Logic and Philosophy of the later Buddhist world—throwing a flood of light on such abstruse topics as Antar vyapti or inference without example, on the transitoriness of the Phenomenal world, on the latent meanings of words and so on, which but for his interest in them, would have remained absolutely unknown.

Rudra Chandra Dev, one of the greatest Rajas of Kumaon, a contemporary of Akbar, wrote a work on Falconry and Hawking which the Shastri has edited and translated into English. This book also would have remained unknown but for his interest in it. Lord Curzon thinks—it is an extremely interesting book.

The publication of the fragments of Chatussatika was perhaps the hardest nut the Shastri had to crack. Out of about a hundred leaves, only twenty-three reached his hand, with the original leaf-marks carefully obliterated and it took him years of study to locate these leaves into their proper chapters. The work was written by the greatest philosophical writer of the Mahayana School and the commentary was also by a man celebrated in Buddhist Literature. So the work, however difficult, had to be done and it has been done.

In the Durbar Library of Nepal, the Shastri discovered an unknown Epic entitled Saundarananda

by no less a poet, philosopher and musician than Asvaghosa the guru of Emperor Kaniska. So it was a twin sister of the Epic Buddha Charita. It was unknown even in China and Tibet, though in Hindu and Jaina Literature occasional quotations from it were observable. The Shastri published it from an old, dilapidated Palm-leaf manuscript and an eighteenth century paper-manuscript, with an introduction and notes.

The Ram Charita was also a discovery of the Shastri. It is the only historical work in Eastern India; but the task of editing it was exceedingly difficult as it is throughout in double entendre—giving the history of Rampal, the King of Bengal, on the one hand and the story of the Ramayana on the other.

Fortunately a canto and a half out of four cantos was accompanied by an excellent commentary supposed to be by the author himself. The Shastri didn't think himself justified to make a commentary of his own for the rest of the book, as that would seem to be too audacious in the present state of our knowledge of the Pala period." (এই রামচরিত সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে।)

কোন টীকা টিপ্পনীর সহায়তা না লইয়াই শাস্ত্রী মহাশয় কেবল সূত্র দৃষ্টে ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ "গৌতম সূত্রের" অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ইহা করিতে যাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এই সূত্র একজন লোকের লেখা নয়, ইহা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, এই ন্যায় শাস্ত্রের যেমন যেমন উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই ক্রমে, লেখা হইয়াছে। তিনি আরও দেখাইয়াছিলেন

যে, এই "গৌতম সূত্রকেই" অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধেরা তাহাদিগের ন্যায়ের উন্নতি করিয়াছে এবং ঐ বৌদ্ধ-ন্যায় অদ্যাপি চীন ও জাপানে অধীত হইতেছে। তাঁহার এই অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই।

আমাদের পরিচয়ঃ—

১৩২১ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। পরিচয় ঘটিবার কারণও অভিনব। আমার জ্যোতিষ-চর্চ্চাই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার হেতু। ইহাতে সাধারণতঃ মনে আসে যে, হাত দেখা বা কোষ্ঠী-দেখা হইতেই কিংবা জ্যোতিষ-অধ্যয়নই বুঝি আলাপের কারণ। তাহা নহে। যদিও শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিত তারাচরণ বাচস্পতির নিকট জ্যোতিষের গণিত কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি জ্যোতিষের গণিত বা ফলিত ইহার অনুশীলন ও আলোচনা করেন নাই। তারপর ফলিত জ্যোতিষে তাহার বিশ্বাস কতদূর দৃঢ় ছিল তাহা বলিতে পারি না; কেন না, কোন দিন তাঁহাকে নিজের বা পুত্রাদির কোষ্ঠী-বিচারাদি করাইতে দেখি নাই। আর তাহার কোষ্ঠী দেখিতে চাওয়ায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি একবার খুঁজিয়াছিলেন, পান নাই, বোধ হয় হারাইয়া গিয়াছে। তবে একেবারে যে তিনি ইহা মানিতেন না কিংবা এ সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কারণ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহের যোটক-মিল দেখিয়া দিতে এবং আরও দুই একবার দিন দেখিয়া দিবার জন্য আমায় বলিয়াছিলেন।*

১৩২১ সালে আমি ফলিত জ্যোতিষের গবেষণায় বিশেষ মনোযোগী ছিলাম। তখন জানিতে পারিলাম, "ভৃগুসংহিতা" বলিয়া একটি বই আছে। ইহা জ্যোতিষের অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত পুস্তক। ইহাতে মনুষ্যের জাতি, পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম এবং ইহজন্মের জীবনের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ লিখিত পাওয়া যায়। খবর পাইলাম যে, ঐ পুস্তকের পুথি "এসিয়াটিক্ সোসাইটি

* পরিশিষ্ট ক —পত্র সংখ্যা ২০ দ্রষ্টব্য

অব বেঙ্গল" এ আছে। সোসায়িটিতে মাঝে মাঝে বই কিনিতে যাইতাম, কিন্তু ঐ সোসায়িটির সভ্য ব্যতীত তথাকার পুথি পাইবার সুবিধা নাই দেখিলাম। যখন ঐ পুথি চাই তখন এখানকার সভ্য হইতেই হইবে স্পষ্ট বুঝিলাম। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এ, জ্যোতিঃ-শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা থাকায়, তাঁহাকে সোসায়িটির সভ্যদিগের কাহারও সহিত আলাপ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় এবং সোসাইয়িটির সভ্য হইবার আবশ্যক হইয়াছে বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, সে আর বেশী কথা কি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা আছে, তাঁহাকে বলিয়া ইহার ব্যবস্থা করাইবেন। আশুবাবুই আমাকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর শনিবার শাস্ত্রী মহাশয়ের ২৬ নম্বরের পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দেন। ১৯১৬ সালে শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে "এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গলের" মেম্বর বা সভ্য করেন *। এই সন ১৯১৬ হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে। সোসাইটির পুস্তকালয়ে রক্ষিত "ভৃগু সংহিতা" দেখিয়া যেরূপ হতাশ হইয়াছিলাম, (কারণ ইহা আসল নয়), শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গ লাভে সে ক্ষোভ দূর হইয়া সেইরূপ লাভবান্ হইয়াছিলাম। চুম্বক ও লৌহের আকর্ষণের ন্যায় আমাদের মধ্যে আকর্ষণ গাঢ় ও অচ্ছেদ্য হইয়াছিল। আমি তাঁহার পুত্রের বয়সী হইলেও আমাদের মধ্যে প্রীতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বন্ধন বিশেষ জমাট বাঁধিয়াছিল। তাঁহার সহিত আলাপ হইবার পর হইতেই তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান কালে, এমন মাস ছিল না, যে মাসে আমি কয়েকবার তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিয়াছি; ক্রমে ঐ মাসের স্থান সপ্তাহ অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার পুত্রেরা এখন বলেন যে, তাহাদের

---

* এখন ইহার এই বৎসরেই "রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ বেঙ্গল" নাম হইয়াছে।

অপেক্ষা আমিই ইদানীং তাহাদের পিতাকে বেশী দেখিয়াছি। তিনি আমাকে এত ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার সাংসারিক সুখ দুঃখের অনেক কথা আমার নিকট বলিয়া শান্তি অনুভব করিতেন এবং অনেক বিষয়ে পরামর্শও করিতেন।

তাঁহার ভালবাসার একটা কথা বলি। তখন তিনি পা ভাঙ্গিয়া চলৎ-শক্তি হারাইয়াছেন ; পূর্ব্বের ন্যায় আর তাঁহার দৌড় ঝাপ চলে না। তবে কাজ কর্ম্ম যে একেবারে করেন না, তা নয়। তাঁহার এই অবস্থায় রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (এখন স্যর্ হইয়াছেন), আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন যে, যদি শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "ইন্‌ডিয়ান্ মিউজিয়মের ট্রাষ্টিপদ" ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে Recommend করেন তাহা হইলেই তাহার ঐ পদ হয়। আমি ডাঃ ব্রহ্মচারীর এই প্রাণের ইচ্ছা শাস্ত্রী মহাশয়কে জানাই। তাহাতে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন যে, "আচ্ছা তাকে বলিও তাই হবে।" আমি ডাঃ ব্রহ্মচারী মহাশয়কে উহা জানাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে বলি। ডাঃ ব্রহ্মচারীর ঐ পদ প্রাপ্তি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ এখনও তিনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বভাব ছিল অতি সরল। একদিন তিনি বলিলেন, "গণপতি, তোমায় আমি ভালবাসি কেন জান, সকলেই আসে আমাকে exploit করিতে, কিন্তু তুমি সেজন্য কখনও আসনি, এজন্য তোমাকে কখনও আসিতে বারণ করিনি, তুমি আসলে আমায় বিরক্তি হয় না"। সত্যই আমি কখন তাঁহাকে দিয়া কিছু করাইয়া লই নাই কিংবা তাঁহার নিকট হইতে কোন বিষয় জানিয়া, তাহা নিজের বলিয়া জাহির করিয়া নিজের ঢাক পেটাইতে যাই নাই। আমি তাঁহার নিকট যাইতাম কোন লাভের আশায় নয়, ভাল লাগিত তাই যাইতাম। অধিকন্তু তাঁহার নিকট বসিলেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় জ্ঞানলাভ, কিছু না কিছু শিক্ষালাভ

হইত। আর তাঁহার অমায়িক ব্যবহার আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত। এক কথায় তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া, যেমন ফুলের কাছে ভ্রমর যায়, তাঁহার নিকট যাইয়া পড়িতাম। আমার দুই একখানা পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিখিয়া দিয়াছেন এবং "দুর্গাপূজা পদ্ধতি" খানির মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন; এই লিখিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাকে কোন দিন বলি নাই; আশুপণ্ডিত মহাশয়ের কথায় লিখিয়া দিয়াছেন। আমি কামন্দক পণ্ডিতের "নীতিসার" অনুবাদ করিলে এবং উহার প্রথমাংশ "অনাথবন্ধু" পত্রিকায় বাহির হইতে থাকিলে, তাঁহাকে উহা দেখিয়া দিতে পারিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি গোড়ার কয়েকটি শ্লোকের কেমন অনুবাদ হইয়াছে, তাহাই পড়িতে বলিয়াছিলেন, এবং তাহা শুনিয়াছিলেন, তারপর বলিয়াছিলেন, তিনি পারিবেন না। আমিও তাঁহাকে আর বলি নাই। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি নীতিসারে চাণক্যের বর্ণনায় 'সুদৃশ' শব্দটি দেখিয়া তখনি বলিলেন যে, "চাণক্য সুপুরুষ ছিল হে, না হলে এই 'সুদৃশ' শব্দ কামন্দক ব্যবহার করিতেন না। কামন্দক দেখছি চাণক্যের চাক্ষুষ শিষ্য।" ইহার উপর তিনি পরে যে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা Behar Orissa Research Journal এ বাহির হইয়াছে। আমার "কামন্দকীয় নীতিসারের" বঙ্গানুবাদ ছাপান হইলে পর, তাঁহাকে একখণ্ড উপহার প্রদান করি। একদিন আশু পণ্ডিত মহাশয়কে দিয়া দশ বার পংক্তিতে লেখা তাঁহার এক অভিমত আমায় পাঠাইয়া দেন। আমি উহা রাখিয়া দিই। ইহার কিছু দিন পরে ঐ অভিমতটি চাহিয়া লইয়া বলেন যে, তিনি আমার উপর অন্যায় করিয়াছেন, ভাল করিয়া আমার অনুবাদ না পড়িয়াই উহা লিখিয়াছিলেন, এখন পড়িয়াছেন, তিনি ভাল করিয়া লিখিবেন। এ সম্বন্ধে পরে তিনি যে অভিমত লিখিয়াছিলেন, তাহা 'কামন্দকীয় নীতিসার (আলোচনা)" নামে "মাসিক বসুমতীতে" ছাপা হইয়াছে। ইহার পর শুক্রনীতিসারের

বঙ্গানুবাদ করি। ভূমিকা তাঁহাকে দিয়া লিখাইবার ইচ্ছা হয়। তিনি তাহা স্বীকার করেন এবং বলিয়াছিলেন যে কিরূপ অনুবাদ হইল তাহা না দেখিয়া তিনি ভূমিকা লিখিবেন না। সেইজন্য তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার হাতে বইটি দিতাম এবং আমি অনুবাদটি পড়িয়া শুনাইতাম। এইরূপে তিনি সমস্ত অনুবাদটি দেখিয়া দিয়াছেন। সরস্বতীর কৃপায় অনুবাদ দেখিয়া তিনি বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করেন নাই, সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তিনি ভূমিকা লিখিবার ভার লইয়া ছিলেন কিন্তু আমি তো তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে পারি নাই, এইজন্য ঐ ভূমিকা আর লেখা হয় নাই, অথচ আমাকে ভূমিকা লিখিয়া দিবেন ইহা স্বীকার করিবার পরও অনেকের কাজ তিনি করিয়া দিয়াছেন। তারপর তিনি যে সময় উহা নিশ্চয় লিখিয়া দিবেন বলিয়া স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং কি প্রণালীতে উহা তিনি লিখিবেন তাহাও স্থির করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে যে দিন বলিলেন, তাহার পর দিনই তিনি অকস্মাৎ দিব্যধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার এই ভূমিকা লেখা হইলে নীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁহার এক অপূর্ব্বদান থাকিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আর তিন চার দিনের মধ্যেই এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে যে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত পুথির কাব্যগ্রন্থের সবিবরণ পুস্তক-সূচী ছাপা হইতেছে, তাহার মুখবন্ধ লেখা শেষ হইয়া যাইবে, তাহার পরই আমার এই শুক্রনীতির মুখবন্ধ লিখিয়া তবে অন্য কাজ ধরিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের যে তিনি উহা লিখিয়া যাইতে পারিলেন না, আর দুর্ভাগ্য আমার যে আমি তাঁহাকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারি নাই।*

আমার ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ "জ্যোতিষ যোগ-তত্ত্ব" ১ম তত্ত্ব তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। উহাতে যে "জ্যোতিষে পারিভাষিক শব্দাভিধান" লিখিয়াছিলাম, তিনি সেইটির খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং

---

* ক পরিশিষ্টের ১৭ সংখ্যক পত্র ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Reference হিসাবে তাহা নিকটে রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ "জ্যোতিষ যোগতত্ত্বের" দ্বিতীয় তত্ত্ব লিখিয়া তাঁহাকে ঐ পুস্তক উৎসর্গ করি। তিনি তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে, তখন ঐ বইতে কি আছে তাহা পড়িয়া তাঁহাকে একবার দেখিতে হইবে। আমার "রসনির্ঝর" ছাপা হইলে তাঁহাকে উপহার দিই। উহাতে কালিদাসের "শৃঙ্গারাষ্টক" ও "শৃঙ্গার তিলক", অন্যান্য প্রাচীন বিখ্যাত কবিদিগের উদ্ভট শ্লোক ও প্রতি শ্লোকের পদ্যানুবাদ গল্প সহ এবং "ঘটকর্পরকাব্য" নামক ঘটকর্পরের প্রসিদ্ধ যমককাব্যের পদ্যানুবাদ আছে। আর "শৃঙ্গারাষ্টক" ও "শৃঙ্গারতিলক" পুস্তক দুইটির মধ্যে অন্য কবিদিগের শ্লোক কালিদাসের বলিয়া চালান হইয়াছে, তাহা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা পড়িয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তোমার বই পড়েছি কিন্তু জমেনি"। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "অনুবাদে ভুল হয়েছে, না পদ্য নিরস হয়েছে"। তিনি উত্তরে বলেন, "না, সে সব কিছু হয় নি, তবে সব খোলে নি, তা খুলে লিখতে গেলেও বিপদ।" এই বলিয়া কালিদাসের মেঘদূতের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া তাঁহাকে কিরূপ নাকাল হইতে হয় তাহা বলেন। এ ঘটনা আমি পূর্ব্বে অন্যত্র বলিয়াছি। আমার শুক্রনীতির তিনি ভূমিকা লিখিয়া দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমার মধ্যম অগ্রজ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের "গোগৃহ" কাব্যের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে "কর্ম্মরহস্য" এবং "মহারাষ্ট্র জাগরণ" এই দুইটির সমালোচনা-মূলক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। *

শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত রসিক ছিলেন। তিনি যে সকল গল্প করিতেন, তাহাতে তিনি যে কিরূপ সুরসিক তাহা বুঝা যাইত। তাঁহার নিকট "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাগবাজারে গাঁজাখোরের আড্ডা দেখার গল্প, গুলি-

* পরিশিষ্ট ক—পত্র সংখ্যা ১২ এবং পরিশিষ্ট গ—দ্রষ্টব্য।

খোরের গল্প, খনার গল্প, তোতলার গল্প প্রভৃতি উপভোগের বিষয় ছিল। তাঁহার রসিকতা অন্তঃশীলা ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ হইবার এক বৎসর পরে, আমার নিকট যে পণ্ডিত কাজ করিতেন তাঁহাকে দিয়া আর আমার কাজ চলিল না, সেইজন্য একজন পণ্ডিতের আবশ্যক হওয়ায়, শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়াছিলাম যে, "আমার একজন পণ্ডিতের দরকার হয়েছে, একজন ভাল পণ্ডিত দিতে পারেন।" তিনি তাঁহার পণ্ডিতকে আমার জন্য দিবেন বলেন। তাঁহার পণ্ডিত আশুতোষ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সহিত তখন আমার আলাপ ছিল না। একদিন তিনি পত্র লিখিয়া তাঁহার পণ্ডিত মহাশয়কে আমার নিকটে পাঠাইয়া দেন, পত্রটি এই— *

26, Pataldanga Street,
Calcutta, July 27, 1917.

My dear Ganapati Babu,

I wrote you a P. C. in which I gave you all information you wanted. The Utkal gentleman has acknowledged receipt of the impressions but says it will take sometime to find out the meanings of the difficult words.

Pandit Mahasaya is going to you. I am sending him to you as I know you are anxious. He is a good man, well up in Samksipta-sara Grammar, sanskrit literature, and Nyaya. His notions, ideas, and his information and learning in matters of Hinduani are very very sound. You will find him very useful in every way. অনাশ্রিতা ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতা so he goes to you.

Yours sincerely,
HARAPRASAD SHASTRI.

* পরিশিষ্ট ক—পত্র সংখ্যা ১

রসিক পুরুষের চুপ করিয়া থাকিবার উপায় নাই। এই যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার শেষ পংক্তিটি লিখিবার আবশ্যক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়কে পাঠাইতেছেন, তাঁহার সম্পর্কে যা বলিবার তাহা বলা হইয়াছে, তবুও লিখিয়া ফেলিলেন—"পণ্ডিত, স্ত্রী ও লতা আশ্রয় ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না—অতএব এই পণ্ডিত তোমার নিকট যাইতেছেন।" এই টুকুতেই তাহার গভীর রসজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি রসিকতা করিতে গিয়া দুই দুই বার থাপ্পড় খাইয়াছেন। একবার বিখ্যাত নাটককার হাস্য-রসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অগ্রজের নিকট, আর একবার কাহার নিকট বলিয়াছিলেন, ঠিক স্মরণ হইতেছে না। ডি, এল্ রায়ের ভ্রাতা "বঙ্গবাসীর" সম্পাদক-সঙ্ঘে ছিলেন। সেখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের গতায়াত ছিল। একদিন তাঁহারা সকলে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়, জলখাবার প্রস্তুত হইবার খবর চাকর জানাইলে, রায় মহাশয় সকলকে বলিলেন 'চল হে খানা খাবে চল'। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, 'আমরা তো খানা কখন খাই নাই, খানায় আর কিছু করি।' তাহাতে রায় মহাশয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বলেন 'আপনার কিছুমাত্র সভ্যতা নাই, পবিত্র খাবার বিষয়ে আপনি ঘৃণাকর ভাব তুলিলেন।" শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে "আপনি এতটা চটিবেন জানিতাম না, এইরূপ রসিকতায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর শাল দুশালা বক্‌সিস্ দিয়াছেন।" তিনি বলিতেন যে, এখন ক্রমশই রসিকতা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে ; এখন লোকে আর রসিকতা বোঝে না ; হাসি ঠাট্টা করার লোকেরও অভাব ঘটিতেছে। কথাটা খুবই ঠিক। এখন প্রকৃতপক্ষে প্রাণখোলা হাসিও বড় একটা দেখিতে পাই না। তিনি আমাকে একবার পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন—"......বৎসরের প্রথম আশীর্ব্বাদ করি তুমি যেন দীর্ঘজীবী হইয়া ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর [পুত্রে বড় নয় বোধ হয়

কন্যায়]"* আমার পুত্র না থাকায় এবং কন্যাধিক্যের জন্য এইটুকু।† তিনি রহস্যের সুযোগ পাইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমি ভুবনেশ্বর যাই এবং তথা হইতে পুরী যাই। আমার সঙ্গে এ যাত্রায় আমার গুরুদেব ১০৮শ্রী শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় ছিলেন। ভুবনেশ্বরে গৌরীকেদার মন্দিরের নিকট তখন তাঁহার আশ্রম নির্ম্মিত হইতেছিল। উহার ভিত খুড়িবার সময় একটি শিলালিপির আবিষ্কার হয়। উহা আমি ফিরিবার সময় লইয়া আসি। উহার মাঝখানে একটি সুচারু গণেশ মূর্ত্তি আছে, আর ঐ মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুই বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন লিপিতে লেখা, আর একপার্শ্বেও লেখা আছে। সম্মুখে এই লেখার এক ভাগ তামিল ভাষা ও অক্ষরে; আর অন্য ভাগ বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষরে; তবে পার্শ্বে যে লেখা তাহা তামিলে কিন্তু উপর হইতে নীচে চীনা ভাষার ভঙ্গীতে পড়িতে হয়। যে লেখাটির বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর বলিতেছি, তাহার সহিত উড়িয়া ভাষার সংমিশ্রণ আছে। আমার মনে হয়, প্রাচীন উড়িয়া লিপি বাঙ্গালা লিপির ন্যায় ছিল, ক্রমশঃ উহা গোলাকার অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এই শিলালিপির ছাপ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জমিদার (সম্প্রতি পরলোকগত) পুরাণ চাঁদ নাহার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় তুলিয়া দেন এবং ঐ সূত্রে আমার ঐ ছাপ গ্রহণ শিক্ষা হয়। ঐ ছাপ লইয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে পড়িতে দিই। তিনি আমার সামনেই বাঙ্গালা অংশ পড়িয়া ফেলিলেন কিন্তু তখন সম্পূর্ণ অর্থগ্রহ হয় না। এজন্য পরে একজন উড়িয়া পণ্ডিতের সাহায্য লইয়াছিলেন এবং তামিল অংশ

* পরিশিষ্ট ক—১৩ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

† আমার এক পুত্র হয়, সেটি অন্নপ্রাশনের পর মারা যায়। পুত্র-কন্যার কথায়, আমার শুধুই কন্যা, পুত্র নাইই শুনিতেন, সুতরাং ঐ পুত্রের কথা শাস্ত্রী মহাশয়ের ভুলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়।

বুঝিবার জন্য তামিল-পণ্ডিতের সাহায্য লন।* এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই শিলালিপি সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তাহা সোসাইটির নিউ সিরিজ ভলম ২০এর ১ম সংখ্যায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শিলালিপিটির ফটো সমেত বাহির হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ শিলালিপি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। এই শিলালিপির কথা শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় তাঁহার "মন্দিরের কথা" পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়েরই সমুদয় কৃতিত্ব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৯১৬ সালে পুরীতে যাই, সে সময় স্বামীজী মহারাজ পুরীমন্দিরের পাতালগৃহ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার দেওয়ালে লেখা আছে কিন্তু পাঠোদ্ধার হয় না। সেবার দুই তিন দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসি বলিয়া ওখানে কি আছে তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই। তাহার দশ বৎসর পরে ১৯২৬ সালে পুনর্ব্বার পুরী যাই। পুরী হইতে সেখানকার মন্দির ও কোনারকের মন্দিরের সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে পত্র লিখিলে তিনি তদুত্তরে তাঁহারই বন্ধু পুরী-নিবাসী উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ মহোপদেশক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখেন।† তিনি আমাকেই পত্র দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি সদাশিব পণ্ডিত মহাশয়কেও আমার কথা লিখিয়াছিলেন। উড়িয়াদিগের মধ্যে একমাত্র ইনিই মহামহোপাধ্যায় হইয়াছিলেন। আমি যখন মহামহোপাধ্যায়ের সন্ধানে গিয়াছিলাম, তিনিও ওদিকে তাঁহার এক ছাত্রকে আমার বাসায় আমার খোঁজে পাঠাইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় বড় মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার অহংকার

---

* পরিশিষ্ট ক—পত্র সংখ্যা ১—পৃষ্ঠা ৮১ দ্রষ্টব্য।

† পরিশিষ্ট ক—পত্র সংখ্যা ৪ দ্রষ্টব্য।

ছিল না, আর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল। তাঁহার নিকট পুরা ও কোনারকের অনেক সংবাদ পাইলাম। তিনি তাঁহার "শ্রীজগন্নাথ মন্দির" নামক পুস্তক আমাকে উপহার দেন এবং "কল্যাপদ্ধর্ম" নামক যে স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহাও দেখান। ইহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও সৎ-সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তক মুদ্রণে তাঁহাকে আমি ৫০৲ টাকা দিয়াছিলাম। তিনি আমাকে পুরীমন্দিরের কয়েকটি শিলালিপির ছাপ প্রদান করেন এবং তাহাতে কি আছে, তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। ঐ লিপিগুলি কোন মন্দিরের কোন স্থানের তাহা তখন তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না। এবার আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ হওয়ায় তাঁহাকে লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হয়, সুতরাং ঐ ছাপগুলির সন্ধান লইতে পারি নাই। তাহার পর কলিকাতায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ঐ শিলালিপি লইয়া আলোচনা করি এবং পাতাল-গৃহে শিলালিপি আছে শুনিয়াছি, তাহাও বলি। তখন কতকগুলি লিপির কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করা হয়। * আর স্থির হয় যে, একবার পুরীতে যাইয়া ঐ ছাপগুলি, আসল লিপির সহিত মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তদনুসারে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আমরা পুরীতে যাই। তখন পুরীতে তাঁহার বড় জামাতা শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরীর কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট। আমরা তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করি। তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। আমরা পুরীতে আসিয়াছি শুনিয়াই মহামহোপাধ্যায় মিশ্র মহাশয় দেখা করিতে আসিলেন। পুরীর রাজার ম্যানেজার এবং পুরীর রাজা স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার পর রাজবাড়ী হইতে জগন্নাথদেবের প্রসাদও আসিল। রাজা ও তাঁহার ম্যানেজার পাতালগৃহের শিলালিপি দেখিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া খবর দিবেন বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের খবর পাইয়া আমরা সেখানে গিয়া

* পরিশিষ্ট ক—পত্র সংখ্যা ৫ দ্রষ্টব্য।

দেখি, ঐ পাতালগৃহের দুইটি দেওয়াল ভাল করিয়া ঘসিয়া ধোয়া হইয়াছে, তাহাতে অত্যন্ত ভিজা রহিয়াছে। একে পাতালগৃহটি অন্ধকূপ, সেখানে সূর্য্যদেবের বা পবনদেবের প্রবেশ নিষেধ, তাহার উপর দেওয়াল ও সিঁড়ি সব ভিজা থাকায়, সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই মনে হইল। যাহাই হউক প্রদীপের ও কর্পূরের আলোর সাহায্যে কোথায় লেখা আছে, তাহা দেখিয়া লইলাম কিন্তু সেস্থান এমন অসুবিধাজনক যে সেখানে দাঁড়াইয়া ঐ লিপির পাঠ-উদ্ধার করা সুকঠিন। তথাপি শাস্ত্রী মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের ন্যায় মনের বলে ৮।১০ মিনিট অতি কষ্টে পড়িবার চেষ্টা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে বাহির হইয়া আসিলেন। কাজ অগ্রসর হইল না। তখন দুই ঘণ্টা দারুণ শ্রম স্বীকার করিয়া সমস্ত লিপিগুলির ছাপ সংগ্রহ করিলাম। আমি এক একটি ছাপ উঠাইয়া বাহিরে পাঠাইতে লাগিলাম, আর সম্মুখের অন্য মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাহা অতি মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। সদাশিব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটি ছাপের সহিত আমাদের এই নব সংগৃহীত কয়েকটি ছাপ মিলিয়া গেল, তখন সেগুলির প্রাপ্তিস্থান ঠিক হইল। আর কয়েকটি কোথাকার তাহা স্থির হইল না। পূর্ব্বগৃহীত ও নবগৃহীত এই দুই ছাপ পাওয়ায় পাঠ উদ্ধারের সুবিধা হইবে মনে হইল। শাস্ত্রী মহাশয় একখানির পাঠ সেই-খানেই প্রায় উদ্ধার করিয়া ফেলেন। আমাদের জন্য দেওয়াল সাফ করায় লাভের অপেক্ষা লোকসানই বেশী হইয়াছে; দেখিলাম যে, পূর্ব্বে অক্ষর যত ভাঙ্গা ছিল, এবার পরিষ্কার করিতে তাহা অপেক্ষা আরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা এবার তাহার অবস্থা আরও সঙ্গিন হইয়াছে। পুরীর মন্দিরের উত্তরের প্রধান দরজা দিয়া ঢুকিতেই দক্ষিণ দিকে এই পাতালগৃহটি অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বমুখী এবং পাতালেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। এই মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছিলে দুই দিককার দেওয়ালে শিলালিপি দেখা যায়। স্থান অতি

সংকীর্ণ। বামদিকের লিপিগুলি স্পষ্ট এবং উপর হইতে মাঝখান পর্য্যন্ত লিপি আছে। উপরের গুলি তেলেগু ভাষার লিপি। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার হইলে উড়িষ্যার ইতিহাসে নূতন তথ্য যোগাইবে। পুরী হইতে ফিরিবার পর শাস্ত্রী মহাশয় নৈহাটী যাইবার কালে কলিকাতার রাস্তায় পড়িয়া যান, তাহাতে তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্য লিপিগুলির পাঠোদ্ধার কাজ বন্ধ থাকে। তাহার পর যখন তিনি সুস্থ হইলেই—অবশ্য পূর্ণ সুস্থ আর হইলেন না, কেননা পা আর পূর্ব্বের মত হইল না—যখন ঐ লিপি উদ্ধারের কথা বলিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এক তাম্রফলক পাঠাইয়াছে, উহার পাঠোদ্ধার না করিয়া ইহা করিতে পারিবেন না। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার মমতা এতই ছিল। যাহাই হউক তিনি আর ঐ লিপির পাঠোদ্ধারে মন দিতে পারেন নাই; কিন্তু মৃত্যুর বৎসরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্ব্বে তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে পুরীর মন্দিরের এক পুরোহিতের বিষয়ের প্রবন্ধ পড়েন, সেই সূত্রে ঐ সভায় আমাদের আনীত ও সংগৃহীত পুরীর শিলালিপিগুলির উল্লেখ করেন এবং ঐ গুলি সেখানে দেখান হয়। আজও ঐ গুলির পাঠোদ্ধার পূর্ণরূপে হয় নাই বলিয়া, কোন স্থানে বাহির করিতে পারা যায় নাই।

আমাদের পুরীতে থাকার সময় একটি ঘটনা ঘটে। যদিও ইহা তুচ্ছ ঘটনা তথাপি উল্লেখযোগ্য। আমরা তো ১৩৩৪ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পুরীতে রওনা হইয়া ৯ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। এই অত্যল্প দিন থাকার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে এক তার (টেলিগ্রাম্) যায়। তারের নামেই তিনি বিশ চঞ্চল হইয়া পড়েন, তারপর উহা পড়িয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তাঁহার ঐরূপ উৎকণ্ঠিত হইবার হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলেন যে, "আমি পুরীতে এসে যে যে বার তার পেয়েছি, প্রত্যেকবারেই দুর্ঘটনার সংবাদ এসেছে, তাই তার দেখেই মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। একবার পুরীতে এসে

কোনারকে রওনা হয়েছি। তখন গরুর গাড়ীই ভরসা ছিল, যেতে একদিন লাগত। বাড়ী হইতে এক বিপদের তার পথের মধ্যে পেয়ে ফিরিয়া আসি। আর একবার কোনারকে যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত, এমন সময় তার পাইলাম স্ত্রী দেহত্যাগ করেছেন, বাড়ী ফিরিলাম। তাই টেলিগ্রাম দেখিয়াই বুকটা দুলে উঠ্‌ল, না জানি কি সংবাদ এনেছে।" তিনি সারা ভারত ঘুরিয়াছেন কিন্তু কোনারক তাঁহার দেখা হয় নাই। *

আমার বন্ধুবর পুরাণ চাঁদ বাবু তাঁহার সংগৃহীত কামরূপ প্রদেশের কতকগুলি শিলালিপি আমায় দেন এবং সেইগুলির পাঠোদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে আসল লিপিগুলি দেখিবার ইচ্ছা হয়। সেইজন্য ১৩২৪ সালের ১১ই ফাল্গুন আমি কামাখ্যাধামে যাত্রা করি। সঙ্গে ৺আশুতোষ তর্কতীর্থ পণ্ডিত মহাশয় ও আমার ভগ্নীপতি ৺আভাষচন্দ্র মিত্র ছিলেন। আর মা ও জ্যেঠাই মা এই সুযোগ লইয়া তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন। এখানে আমরা আসল লিপিগুলির সহিত আমাদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত লিপিগুলি মিলাইলাম, এবং নূতন লিপিও পাইলাম, আর নূতন ছাপও লইলাম। তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে পাঠোদ্ধার করিলাম। লিপিগুলি সমস্তই বঙ্গাক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়। শাস্ত্রীমহাশয়ও এগুলি দেখিয়া দিয়াছিলেন। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার হইলে, পরিষদে পাঠ করিবার উপদেশ শাস্ত্রী মহাশয় দেন এবং এই সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধেয় ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ীতে আমায় লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত করেন। অবশ্য আমি তাঁহাকে চিনিতাম, কেননা আমি যখন রিপন কলেজে পড়ি, তিনি তখন সেখানকার প্রিন্সিপল্‌। দুই চার বার কার্য্যাতিকে তাঁহার সহিত কলেজেও দেখাশুনা কথাবার্ত্তাও হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ ছাত্র না হওয়ায় ঠিক পরিচয় ছিল না, আর কলেজের

---

* পরিশিষ্ট ক—পত্র সংখ্যা ৪।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ছাত্রকে প্রিন্সিপলের মনে রাখাও কঠিন, যদি বিশেষ কারণে ঘনিষ্ঠতা না জন্মে। যাহাই হউক এই শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার "কামরূপের শিলা-লিপি" নামে এক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৫শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পাঠ করি এবং তাহা পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" পুস্তকের উপর "বিধবা বিবাহ ও হিন্দুধর্ম্ম" নামে আমি এক সমালোচনাপূর্ণ পুস্তক লিখি এবং তাহা শাস্ত্রী মহাশয়কে উপহার দিই। ইহা সাধারণে বিতরণ করি। এই পুস্তক প্রসঙ্গে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা উঠে বলিয়া মনে হইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আশু বাবুর সঙ্গে তাঁহার অত্যন্ত হৃদ্যতা ছিল। তাঁহাদিগের সৌহার্দ্দ এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার পুত্রদিগের নামকরণে আশুতোষের "তোষ" দিয়া নাম রাখিতেন এবং আশুবাবুও হরপ্রসাদের "প্রসাদ" দিয়া পুত্রগণের নামকরণ করিতেন। প্রকৃতই উভয়ের পুত্রদের নামে ইহা পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের অপেক্ষা আশুতোষ বয়ঃকনিষ্ঠ থাকিলেও উভয়ের মধ্যে অতিমাত্র সম্প্রীতি হইয়াছিল। তিনিই আশুবাবুকে ইউনি-ভারসিটি এবং এসিয়াটিক্ সোসায়িটি প্রভৃতিতে পরিচিত করেন। তাঁহা-দিগের এই গভীর ভালবাসাও বিধবা-বিবাহ হইতেই নষ্ট হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যখন একবার নেপালে গিয়াছিলেন, সেই সময় আশুবাবুর পত্র পান যে, তিনি তাঁহার বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে চান, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত কি। শাস্ত্রী মহাশয় এই বিবাহের সাপক্ষে মত দিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই উভয়ের মধ্যে এত ভালবাসার বন্ধনও ছিন্ন হয়। সংসারে স্বার্থ ও জিদের দরুণ কতই না অনর্থ অঘটন ঘটে। ফলে শাস্ত্রী মহাশয়ের হয় ত কিছু আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহা নগন্য; পরন্তু প্রকৃত ক্ষতি দেশেরই হইয়াছে। এই ক্ষতি কি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর তাঁহাদিগের উভয়ের এই মনোমালিন্যের সুযোগে কয়েকজন

সুবিধাবাদী নিজেদের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথ নাথ তর্কভূষণ, (তখন মহামহোপাধ্যায় হন নাই), শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে খুব মিশিতেন, এবং আনুগত্য করিতেন। তিনি এই ঘটনার পর, শাস্ত্রী মহাশয়কে ত্যাগ করিয়া আশুবাবুর সহিত মিলিত হইলেন। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও শাস্ত্রীমহাশয়ের একান্ত অনুগত ছিলেন। তাঁহার নিকট পণ্ডিতজী যথেষ্ট উপকার পাইয়াছেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার কালিদাস-প্রসঙ্গ লিখিবার গণেশ করিয়াছিলেন কিন্তু রাজেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার ঐ লেখা লইয়া আশুবাবুর দলভুক্ত হন এবং পরে সেই লেখা অবলম্বনেই বিদ্যাভূষণের "কালিদাস" পুস্তক বাহির হয়।

মাতৃভাষায় শিক্ষা না দেওয়া অযৌক্তিক বলিয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালাকে শিক্ষার মূলভাষা করিতেছেন। বাঙ্গালায় শিক্ষা হওয়া উচিত কিনা এই প্রসঙ্গে কথায় কথায় শাস্ত্রীমহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, এই দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য পেট্লার (Pettler) সাহেব প্রথম চেষ্টা করেন। পেট্লার একবার পাটনায় Inspector of Education হইয়া যান। তিনি এক স্কুলে যাইয়া ছাত্রদের নদীর সংজ্ঞা (definition) কি জিজ্ঞাসা করেন। ছাত্ররা গড় গড় করিয়া ইংরাজীতে ডেফিনেসনটি বলিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন 'তোমাদের নিজের ভাষায় নদী বলিতে কি বুঝিয়াছ বল তো।' কেহই বলিতে পারিল না, কেননা কেহই কিছু বোঝে নাই, শুধু মুখস্থ করিয়াছে। সাহেব দেখিলেন গঙ্গা নদী তাহাদের স্কুলের নীচে প্রবাহিতা, তাহারা সংজ্ঞাটি ঠিক মুখস্থ করিয়াছে, অথচ কিছুই বুঝে নাই, কোনও জ্ঞানই হয় নাই। তিনি তারপরই কলিকাতায় Director of Education হইলেন। তখন তিনি প্রকৃত শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় Entrance School এর 4th class পর্য্যন্ত কেবল বাঙ্গালায় পড়ানর ব্যবস্থা করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। (এখন ঐ Entrance স্থলে Matriculation হইয়াছে; আর শ্রেণীর নাম বদল

হইয়াছে, তখনকার প্রথম শ্রেণী এখন দশম শ্রেণী হইয়াছে, এইরূপ ক্রমে সব ওলট পালট ঘটিয়াছে)। তাহার Personal Assistant কুঞ্জবাবু তাহাতে প্রথম আপত্তি তুলেন। স্যর স্থরেন্দ্রনাথ (তখন স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্থরেন বাড়ুজ্যে) এবং স্যর গুরুদাস (তখন জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) পেট্‌লারের কাজে বাধা দেন। শাস্ত্রী মহাশয় পেট্‌লারের সাপক্ষে মত দিয়াছিলেন। সে সময়, বোধ হয়, ছোট-লাট সার জন্‌ উডবর্ণের আমল। একমাত্র শাস্ত্রী পেট্‌লারকে সমর্থন করায় তাঁহাকে ছোটলাট ডাকিয়া এ বিষয়ে কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিবাদ প্রচণ্ড হওয়ায়, দেশের এই কল্যাণকর শিক্ষার প্রবর্ত্তন তখন হইতে পারে নাই।

তাঁহার সহিত ভালরূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর, এক দিন তাঁহাকে research শিখিবার পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করি। তাহাতে তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, তাঁহারা যখন research আরম্ভ করেন, তখন মূলমন্ত্র ছিল, সাহেবেরা যাহা বলিয়াছে তাহা মানিয়া লইতে হইবে। আর তাহাদের appreciationই চতুর্বর্গ প্রাপ্তি। সাহেবদিগের পদানুসরণ করিয়া যাওয়া চাই। ইহা ব্যতীত নাম হইবে না কিংবা চাকরি প্রাপ্তি বা পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তাহা শুনিয়া বলিয়াছিলাম, ইহাতে তো সত্যের অপলাপ হইতে পারে। তিনি উত্তর দেন যে, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সাহেবেরা যাহা বলে তাহা অনুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারা আকর না দেখিয়া কিছু করে না, স্থতরাং তাহাদের সবই সত্য, তাহাদের প্রতিবাদ করিবার সাহস কাহারই ছিল না, আর প্রতিবাদ করিয়া হাস্যস্পদ হইবার ভয় ছিল। আর তাহাদের বিপক্ষে গেলে উন্নতির আশায় ছাই পড়িত। অতএব যাহারা নাম যশ অর্থের প্রার্থী তাহারা কেহই সাহেবদের বিপক্ষতা-চরণ করিত না। আর একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইলেই শিক্ষা হইল বলিয়া আমার মনে হয় না, এ বিষয়ে তাঁহার

মত কি? তদুত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁহার শিক্ষা তো আরম্ভ হয় এম-এ পাশ করার পর। আর এক সময় তাঁহাকে বলি যে, "আপনি শুধু বেদই মানেন কিন্তু পুরাণগুলিকে একেবারেই আমল দেন না, কিন্তু যদিও আমি বেদ বিশেষ বুঝি না, তবুও আমার অনুমান যে, বেদ বুঝিতে হইলে পুরাণের আবশ্যকতা আছে।" তিনি উত্তরে বলেন যে, "পুরাণ একবার পড়িয়াছিলাম, ওতে কিছু নাই, সাহেবরা বলেছে ওগুলো আধুনিক, Research‌এর জন্য বেদই একমাত্র গ্রাহ্য।" অবশ্য তখন আর তাঁহার কথার কোন প্রতিবাদ করি নাই, কিন্তু মন সন্তুষ্ট হয় নাই। যাহাই হউক, তাঁহার ঢাকায় কয় বৎসর থাকিবার সময়, এসিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে পুরাণের সবিবরণ সূচীপত্র তৈয়ারী করিবার জন্য, পুরাণগুলি পুনর্ব্বার তাঁহাকে পড়িতে হয়। এবার তিনি পুরাণকে আর ভুয়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। এতকালকার বহুদর্শন এবার ফলদায়ী হইল। তিনি পুরাণের মধ্যে বেদ বুঝিবার অনেক কিছু এবার পাইলেন। ঢাকা হইতে ফিরিয়া তিনি এ সত্য প্রকাশ করিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন এবং লিখিয়াও ছিলেন যে, বেদে যে সব রাজা ও ঋষি আছেন, তাহাদের কথা পুরাণে আছে, এইরূপ অনেক বিষয় আছে, সুতরাং বেদের অবস্থা ভাব প্রভৃতি সঠিক বুঝিবার চাবিকাটি হইল পুরাণ। অবশ্য আমার সঙ্গে পূর্ব্বে যে তাঁহার এই বেদ ও পুরাণ লইয়া কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ ছিল না, থাকার কথাও নয়। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল গবেষণার পর তিনি দেখিতেছেন যে, সাহেবেরা গবেষণা ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছে, অনেক শোনা কথার উপর ভিত্তি করিয়া লিখিয়াছে, অনেক স্থলে মূল পুস্তকাদি দেখেও নাই বা অংশত দেখিয়াছে, অনেক কিছু না বুঝিয়া গোল করিয়া মনগড়া মত লিখিয়াছে, আবার অনেকে ভারতবর্ষের সভ্যতাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিব না বলিয়া, অনেক রকম বলিয়াছে, এমন কি ভারতকে ছোট করিবার প্রয়াসও

করিয়াছে। তিনি ইদানী বলিতেন যে, তিনি পূর্ব্বে ভাবিতেন যে, যে সাহেবেরা সংস্কৃত-চর্চ্চা করে তাহারা সংস্কৃতে না জানি কত বড় পণ্ডিত কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহাদিগের পাণ্ডিত্যের কথা আর কি বলিবেন, তাহারা গড়গড় করিয়া সংস্কৃত পড়িতেও পারে না। তাহাদিগের অধ্যবসায় অসাধারণ, তাহারা প্রতি শব্দের সূচি করিয়া লইয়া, তাহার সাহায্যেই যাহা কিছু করে। এখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ভারত সম্পর্কে সাহেবেরা যে সকল ভুল করিয়াছে, তাহা তিনি এক এক করিয় ধরিয়া দিবেন। আশাই রহিয়া গেল, আশার পূরণ আর হইল না। এমনই ভারতের জোর বরাত!

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন—একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া নিজের চেষ্টায় বাণী ও কমলার কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অনেকেরই মস্তিষ্ক গরম হয় কিন্তু তাঁহাতে তাহা হয় নাই। বিদ্যার পূর্ণফল বিনয়লাভ তাঁহার হইয়াছিল এবং ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করিয়াও তিনি অহংকারশূন্য ছিলেন। তিনি গুণের এবং গুণীর আদর করিতেন। তিনি হুজুকে স্বদেশী ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রাণে প্রাণে খাঁটি স্বদেশী। স্বদেশী প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থব্যয় করিয়াছেন। "যশোহর ঝিনাইদহ রেলওয়ে" এবং "কমলা বুক ডিপো"র মোটা অংশ (সেয়ার) কিনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্নতত্ত্ব-আলোচনা দেশের সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়াছে। নেপালের জঙ্গবাহাদুর মহারাজা চন্দ্র সমসেরের এক পুত্র তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের যাবতীয় লেখা সযত্নে বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, লোকে দেশের কাজ দেশের কাজ বলে, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কাজই (প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা) দেশের সব চেয়ে বড় কাজ; ইহাই প্রকৃত স্বদেশ-সেবা।

শাস্ত্রী মহাশয় দানশীল ছিলেন। কিন্তু এই দানের অহমিকা তাঁহাতে ছিল না। তাঁহার দানের কথা বোধ হয় কেহই জানে না। আমার সঙ্গে

তাঁহার সমস্ত কথাই হইত, তাহাতে একবার মাত্র তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাও জানাইবার জন্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscript ছাপানর জন্য ১৮০০০৲ দিয়াছেন। দেশের স্কুলের জন্য ২৫ কি ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। এইরূপে দেখা গিয়াছিল প্রায় ৫০০০০৲ টাকা ব্রাহ্মণ দান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতব্রাহ্মণের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। বন্ধু বান্ধব পরিচিত বিপন্ন ব্যক্তিগণকে তিনি অনেক সময় মোটা আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। নামের জন্য তিনি দান করেন নাই; সুতরাং তাহার দানের কথা সংবাদ পত্রের স্তম্ভে লোক জানানর জন্য বিঘোষিত হয় নাই।

তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি নিজ হাতে বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে বাড় দিয়াছেন,—বড়ি খাইতে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার দেশে নৈহাটী হইতে দশ বার মাইল দূরে মদনপুরে এক ক্ষুদ্র নিষ্কর কিনিয়া সেখানে বাগান করাইয়াছিলেন, সেই বাগানে নিজে হাতে বেগুন গাছ তরি তরকারী প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, "চল গণপতি আমার মদনপুরে, তোমায় বাগানের তৈয়ারী জিনিষ খাওয়াব"। অদৃষ্ট আমার ভাগ্যে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি মৌরলা মাছ, ভাঙ্গন মাছ, মানকচু খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া, আমি আমাদিগের জমিদারির মাছ ও বাগানের কচু প্রভৃতি কখন কখন পাঠাইয়াছি। তিনি নিজ হাতে গৃহস্থালীর কাজ করিয়া আনন্দ পাইতেন। সময়ে সময়ে বামনঠাকুরকে রান্নার হদিস্ বাৎলাইতেন। শাস্ত্রীমহাশয় লোকজনকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। সি, আর্ দাশ প্রদত্ত বঙ্কিমবাবুর স্মৃতিফলক বঙ্কিমবাবুর কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসান উপলক্ষ করিয়া একবার সকল সাহিত্যিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরিভোজন করাইয়াছিলেন। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল বটে

৺ রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ

কিন্তু সে দিন বাড়াতে কাজ থাকায়, আমি উহাতে যোগ দিতে পারি নাই। ইহারপর নৈহাটীতে "সাহিত্য-সম্মিলন" ডাকেন। তাহাতে তাঁহার বহু অর্থব্যয় হয়। ইহাতেও তাঁহার বাড়াতে সাহিত্যিক-দিগকে আহ্বান করিয়া বিরাট ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবশ্য এবার আমি যোগদিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, প্রথম বয়সে তিনি পদ্যও লিখিয়াছেন এবং তাঁহার পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিলে, উহার নিদর্শন মিলিতেও পারে। যখন যোগেন বসুর 'বঙ্গবাসী' সংবাদ পত্রে শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষা সম্বন্ধে নিরন্তর লিখিতেন, তখন বসুজার ও তর্কচূড়ামণির বিপক্ষ পক্ষ উঁহাকে ধরিয়া এক আধবার গদ্যে পদ্যে কেচ্ছা লিখাইয়া লইয়াছে।

একবার কি এক কথায় আমার পণ্ডিত মহাশয় ৺রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের কথা উঠিলে, শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "একদিন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কথায় কথায় বিদ্যাসাগর বলেন 'তোর দাদা নন্দলাল ছেলে ভাল ছিল কিন্তু মদ ধরে বয়ে গেল, যাক্ তাকে অনেক করে এখন মদ ছাড়িয়েছি।' পাশের ঘরেই রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত ছিলেন, তিনি অমনি বেরিয়ে এসে বল্লেন, 'সে আবার ধরেছে'। যাই বলা, অমনি বিদ্যাসাগর তার দিকে হাত বাড়িয়ে মুখভঙ্গী করে বল্লেন 'তুই আর বলিস্‌নে'। পণ্ডিত অমনি পড় পড় করে পালালেন, এ দিন এখনও আমার চখে ভাস্‌ছে। তিনিও মদ খেতেন তাই তাকে বিদ্যাসাগর ঐ রকম করেছিলেন।" রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় কাব্যে খুব ভাল ও বড় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগরের খুব প্রিয়পাত্র হন। তাঁহার পান দোষ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, নিজের কাছেই পুত্রের মত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে ও স্কুলে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়কে পড়াইতে হইত এবং বিদ্যাসাগরের অনেক কাজই তাঁহাকে করিতে হইত।

স্বনামপ্রসিদ্ধ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও "সাহিত্য" সম্পাদক সুসাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রামসর্ব্বস্বেরই ছাত্র।

বঙ্কিমবাবুর অনেক কথাই তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। বঙ্কিমীযুগে মদ খাওয়াটা সভ্যতার অঙ্গ ছিল। বঙ্কিমবাবু স্বয়ং একটু পান করিতেন। এমন কি মাত্রা কম হইলে সে দিন তাঁহার লেখা জমিত না। তিনি অনেককে মদ ধরাইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার বৈঠকখানায় শাস্ত্রীকে মদ খাওয়াইবেন জিদ্ ধরিলেন, শাস্ত্রী অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, কিছুতেই মত বদলাইল না, শেষে শাস্ত্রী যখন তাঁহার কথায় মদ খাইতে রাজি হইতেছেন না দেখিলেন, তখন শাস্ত্রীকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া বুকে বসিয়া হাতে মদের গেলাস লইয়া শাস্ত্রীর মুখে ঢালেন আর কি, এমন সময় শাস্ত্রী বলিলেন, "তু'পুরুষ মজাবেন"? অমনি ল্যাবেনডিস্ বলিয়া বঙ্কিমবাবু শাস্ত্রীকে ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন, "কি হে বঙ্কিম, অত তোড়জোড়ের পর, কি হলো, অমন করে ঠিক্‌রে উঠ্‌লে কেন?" উত্তরে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "দেখলে না, হরপ্রসাদটা কিনা আমায় খোটা দিলে, বললে কিনা তু'পুরুষ মজালেন—ওর শ্বশুরকে মদ ধরিয়েছিলুম কিনা।" যাক্ শাস্ত্রী তো বাঁচিয়া গেলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন নেশাই ছিল না. কিন্তু ছিল এক নেশা, সেটি নস্যের। ইদানি বাজারের কোন নস্যতে তাঁহার শানাইত না, মতিহারি তামাক গুড়া করিয়া নস্য লইতেন। তাঁহার নিকট কত পুরাতন কথাই শুনিয়াছি, কত আবার ভুলিয়া গিয়াছি, সময়ে সময়ে আবার কতক মনে পড়ে। সব কথা বলাও চলে না, লেখাও চলে না।

৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের গ্রাম জেমো হইলেও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে কাঁদিতে তুইটি পান্থশালা লালগোলার রাজা যোগেন্দ্র নাথ রাও স্থাপনা করেন। তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতি মনোনীত করিয়া সেখানে লইয়া যান। ইহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের নিমন্ত্রণ হয়। তাহাতে আমি, শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্তপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ অনেকে গিয়াছিলাম। এখানে আমাদিগের সমাদর যথোপযুক্ত ভাবেই করা হইয়াছিল। কাঁদির স্কুল দেখিতে লইয়া যাওয়া হয়। এখানেই প্রথম জানিতে পারিলাম যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বে শরৎ নাম ছিল। অমূল্য বাবু বলেন এ আবিষ্কার তাঁহার। শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র আশুবাবু বলেন যে, 'যৌবনে সন্ন্যাসী' প্রবন্ধ পড়িয়া তিনি তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, এ শরৎ লোকটি কে ? সুন্দর লেখা। তাহাতে শাস্ত্রীমহাশয় উত্তর দেন—"তোর বাবা"। তাহার পর তিনি পুত্রকে বলেন যে, সে সময় তিনি ছেলে বেলায় শরৎ নাম লিখিতেন।

শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের লোক। তাঁহাদিগের সকলের সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহাদিগের সম্পর্কে কত গল্পই তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। তাঁহার দেহ-রক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব আমলের লোকদিগের সম্বন্ধে তিনি প্রাচীন স্মৃতি-কাহিনী বলিবেন আর আমি লিখিব, কিন্তু তাহা আর হইল না। তাহার নিজের জীবনের বাল্য-কথা কিছু বলিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়া লইয়াছিলাম ; বাকি কথা বলিবার আর সময় হইল না। ঐ অসম্পূর্ণ কথা লইয়াই আজ তাঁহার জীবন-কথার কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম।

শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে কয়খানি আছে তাহা পুস্তক মধ্যে এবং পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

অনেককেই তিনি পত্র লিখিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহার পত্র আমায় দিয়াছেন সেগুলিও পরিশিষ্টে স্থান পাইল।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কাশীধামে বসিয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জীবনী সমাপন করিতেছি :—

হরপ্রসাদের বিয়োগে

এ কি শুনি অকস্মাৎ, এ যে যেন ইন্দ্রপাত,
বিদ্বান-সমাজ-চূড়া ভেঙ্গে গেল হায়,
কি দুর্ভাগ্য বাংলার ভাষা নাই বলিবার
গৌরবকেতন-চ্যুতি ঘটে বাংলায় ।১।

বাংলার নহে শুধু সে যে ভারতের মধু,
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান,
কাল হরিয়াছে তাঁরে নিজ ভাণ্ড পুরিবারে
ধরারে করিয়া দীনা হরি সুসন্তান ।২।

শির-শূন্য ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব পেল' নাশ,
সাহিত্য হইল পঙ্গু, যাঁরে হারা হয়ে.
সে হরপ্রসাদ তরে বঙ্গবাণী-অশ্রু ঝরে,
ভারতী ভারতীহীন বুকে ব্যথা লয়ে ।৩।

ইতিহাস-আদি কথা কে শুনাবে গল্প যথা
অনর্গল অবিরত যেন প্রস্রবণ,
অপূর্ব্ব সে স্মৃতিশক্তি সরল সরস উক্তি
দুর্বোধ্য ছিল না সেথা, সহজ কেমন ।৪।

বৌদ্ধ-তত্ত্ব মূর্ত্তিমান্ ছিল যেথা বর্ত্তমান,
সকলে সন্ধান নিত যে মহা আকরে,
কালের কুটিল গতি, লুপ্ত এবে সেই জ্যোতি,
নাম শেষ হায় তার শুধু ধরাপরে ।৫।

কালিদাস-কথামৃত কাব্যসুধা সমুদ্ধৃত
সে রস সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শুনাবে কে আর,
তথ্য ইতিহাস সনে সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণে,
কত নব ভাব জ্যোতি বিকসিত তার ।৬।

একদিন যার সনে হইয়াছে আলাপনে
সেই মুগ্ধ হয়ে গেছে গুণগ্রামে তাঁর,
সরল উদার প্রাণ মহৎ হৃদয়খান
কত মধুময় ছিল কি বলিব তার।৭।

রসিক সরস কত ছিল সেই মহাব্রত
যে বুঝেছে সে মজেছে ভক্ত হয়ে তাঁর ;
সে কালের কত কথা ছিল সেই হৃদে গাঁথা
সুধিলে ক্ষরিত তাহা যেন উৎস-ধার।৮।

কীর্ত্তি তব অবিনাশি রহিয়াছে সুপ্রকাশি
বৌদ্ধতত্ত্ব-ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্ব-পাতে,
সাহিত্যে তোমার দান আছে সদা দীপ্যমান
তোমার তুলনা তুমি এই খ্যাতি ভাতে।৯।

দেশসেবা দেশভক্ত প্রকাশি প্রাচীন তত্ত্ব
করিয়াছ কত যত্নে করি প্রাণপাত ;
ভবিষ্যের বংশধর উপকার নিরন্তর
পাইবে, দানিবে তোমা শ্রদ্ধা হৃদিজাত।১০

পরলোকে তব তরে ভারতী আপন করে
রেখেছে সাজায়ে দিব্য হর্ম্ম্য মনোমত,
প্রিয়পুত্রে সমাদরে রাখিতে আদর করে,
যত গুণীজন সনে পূর্ব্ব সমাগত।১১।

কত না আদর করি স্বর্গ-সুধীজন মরি
অপার আনন্দে তোমা লয়ে মাতোয়ারা,
মানস-নয়নে আহা হেরিতেছি আমি তাহা,
এ ত নহে মৃত্যু, এ যে অমৃতের ধারা।১২।

[সমাপ্ত]

পরিশিষ্ট (ক)

পত্রসংখ্যা ১ — ইহা ৮১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্রসংখ্যা ২

44, Nilkhet Road,
Ramna P.O.
Dacca, July 27, 1923.

কল্যাণবরেষু,

তোমার যখন চিঠি পাইলাম তখন ২১শে শনিবার এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, যাইবারও উপায় নাই। পত্র লিখিলেও তুমি সোমবার বই পাইবে না। তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

২২ তারিখ সাহিত্য পরিষদে কি হইয়াছে খবর পাই নাই। খগেন বাবু ও প্রবোধ বাবু আমায় পদত্যাগ করিয়া "আর ইলেকশনে দাঁড়াইব না এইটি প্রকাশ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হীরেন্দ্র বাবুর পরামর্শ অনুরূপ তিনি বলিলেন এবার আপনি থাকুন তাহার পর আপনাকে আর পদত্যাগ করিতে হইবে না। পাঁচ বৎসর হইলে আপনিই পদত্যাগ আসিয়া যাইবে। এ বৎসর আপনার আসারও দরকার নাই আমিই ম্যানেজ করিতে পারিব।"

আমার শরীর অত্যন্ত কাহিল আমি ঢাকায় আসিয়া নিশ্চিন্ত হইব ভাবিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু তাহার পর আবার যাইতে হয় গবর্ণমেণ্ট হাউসে সেনেটের একটী মীটিং হয় তাহাতে যাইতে হয়। সেই সময়ে তোমার সঙ্গে দেখা হইলে ভাল হইত। কিন্তু হইল না তুমি আসিতে পারিলে না। আমার শরীর এখনও ভাল সারে নাই। কাজ কর্ম্ম করিতেছি কিন্তু বিশেষ স্ফূর্ত্তি নাই। তোমরা কে কেমন আছ লিখিবে। বিনয় আজও আসিল না সেজন্ত বড় ভাবিত আছি এখানে নিতান্ত একেলা।

শুভার্থী,

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্র সংখ্যা ৩ (পোষ্ট কার্ড)

26, Pataldanga Street,
Calcutta, February 15, 25.

My dear Ganapati,

If I know you are here I will go and see you. I have many thing to talk to you.

Yours affy
Haraprasad Shastri.

পত্রসংখ্যা ৪

Mahamahopadhyaya
Haraprasad Shastri,
C.I.E., M A., F.A.S.B.

26, Pataldanga Street,
Calcutta, March 31, 1926
or Naihati, E. B. R.

কল্যাণবরেষু,

গণপতিবাবু পুরীতে আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার ও গাইড হচ্ছেন মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ। তিনি মন্দিরের পূর্ব্ব দরজায় অর্থাৎ অরুণ স্তম্ভের কিছু পূর্ব্বে এক বাটীতে থাকেন। তাঁহার কাছে আমার নাম করিয়া গেলেই তিনি আপনাকে সব দেখাইয়া দিবেন। তিনি পুরীর যত সংবাদ জানেন অত আমরা কেহই জানি না।

কোনারকটা আমার অদৃষ্টে নাই। একবার যাইতে যাইতে ব্যাঘাত পাইয়া রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসি আর একবার সব উদ্যোগ সত্ত্বেও স্ত্রীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসি। এবার চন্দনযাত্রায় পুরী যাইবার ইচ্ছা আছে তুমি ততদিন থাকিবে কি? কোনারক সম্বন্ধে বইএর কথা পরে লিখিব।

শুভার্থী,
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ৫ 26, Pataldanga Street,
Mahamohopadhaya February 10, 1927.
Haraprasad Shastri, M.A., C.I.E. Calcutta.

কল্যাণবরেষু

কৈ—গণপতিবাবু কৈ তুমি ত এলে না আমি ত বেশ বসিয়া আছি আর মৎস্য পুরাণ পড়িতেছি।

এখন তুমি এলে সব কর্ম্মই হইতে পারে তা শকুন্তলাই হোক আর অনঙ্গ ভীমদেবই হোক আর কর্পোরেশনই হোক আর বেশী দেরী নয় কোন দিন মাথা খারাপ হবে আর কোথায় চলিয়া যাইব।

শুভার্থী,

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্র সংখ্যা ৬ Calcutta, February 13, 1927.

কল্যাণবরেষু

গণপতিবাবু এই নাও তোমার দরখাস্ত কাল দাখিল করিয়া দিও। কাল বা পরশু কোথায় যাইতে হইবে বলিয়া দিও। হীরেন বাবুও যাইতে প্রস্তুত আছেন। সেদিনও তিনি আসিয়াছিলেন তবে তাহার সংস্কার ছিল ৮।৩০ আমরা ৮।২০ মিনিটে বাহির হইয়া যাই। অমূল্যবাবু জ্বরে ভুগিতেছেন।

শুভার্থী,

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ৭ Calcutta, February 22, 1927.

কল্যাণবরেষু

গণপতি বাবু পরশু নলিনী পণ্ডিত নরেনের মোটর লইয়া অনেক জায়গায় গিয়াছিল শেষ তোমাদের বাড়ীও পঁহুছাইয়াছিল। কাল প্রিয়নাথকে সঙ্গে লইয়া রামতারণ বাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তিনি শুনিলাম খুব বাঁকড়া। তারপর আমার এখানে আসিয়া আমার কাছ থেকে পত্র

লইয়া চিপ একজিকিউটিব অফীসারের ওখানে গিয়া ভাল নোট দেওয়াইয়া আমাদের দরখাস্ত এমন জায়গায় ঢুকাইয়া দিয়াছে যে আগামী বৃহস্পতিবারে তাহার মীমাংসা নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। তাহার পর শ্রীযুত সুকুমার রঞ্জন বাবুকে লইয়া আমার এখানে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পরিষদে গিয়া তাহাকে অবস্থা দেখাইয়া দিয়াছি এবং ওয়াহেদ হোসেনের বাড়ী গিয়া তাহাকেও আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে বলিয়াছি। রাত্রি ৯টার সময় নলিনী আমার এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। এখন শুনিয়া তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য কর। আমি আজ রাত্রে যাত্রা করিয়া আগামী রবি বা সোমবার আসিব। আমি অমূল্যকে বৃহস্পতিবার ই জি পি মীটিংএর ঘরের পাশে বসিয়া থাকিতে বলিয়াছি ও নলিনীকে বলিয়াছি সে যেন শরৎ বোসকে সঙ্গে করিয়া মীটিংএ পঁহুছিয়া দেয়।

শুভার্থী,

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ৮ Post card

23, Pataldanga Street,
Calcutta February 28, 1927.

My dear Ganapati

I am back from Dacca. I am anxious to know the result of our application to the Corporation. I am all right.

Yours Sincerely
Haraprasad Shastri.

পত্রসংখ্যা ৯

Calcutta, March 2, 1927.

My dear Ganapati Babu,

What is the matter with my application for a capital grant for the Parisad ?

I come here on Monday and I wrote you a letter immediately but I have got no reply. So I am sending this by the hand of Kulamani.

In the meanwhile Nalini and Amuliya is running about to members of the E. G P. and the Law Officer has given his opinion in an equivocal way.

Yours Sincerely
Haraprasad Shastri.

পত্রসংখ্যা ১০ Post Card.

কল্যাণ বরেষু,

গণপতি বাবু—অনেকগুলি পরামর্শ আছে যদি একবার আজ ৭টার পর আসিতে পারেন বড় ভাল হয়। শুনিলাম পরশু আপনি আসিয়াছিলেন কিন্তু আমি তখনও ইউনিভারসিটি হইতে আসি নাই।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
২৮।৩।২৭

আমার আজ সোসাইটির কাউন্সিল মীটিং আছে ৭টার পূর্ব্বে আসিতে পারিব না।

H.S.

পত্রসংখ্যা ১১ Calcutta, June, 29, 1927.

কল্যাণবরেষু –

গণপতি বাবু, সেই যে গিয়াছেন তাহার পর কোনও খবর নাই। আপনি কেমন আছেন আপনার যে আত্মীয়ের কলেরা হইয়াছিল, তিনিই বা কেমন আছেন প্রায়ই আমার মনে হয় আপনি আজ আসিবেন। কিন্তু না আসায় শেষ মনস্তাপে পড়িতে হয়।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পত্রসংখ্যা ঃ২ 16-7 27

গণপতিবাবু

আপনার দাদার লেখা "মহারাষ্ট্র জাগরণ" আগাগোড়া পড়িলাম। যে অংশটুকু তোমার দাদার নিজের সেটুকু বেশ হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দেরা যেখানে শিবাজীকে দেখিবার জন্য দাঁড়াবার জায়গা লইয়া ঝগড়া করিতেছে সে জায়গাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। এখনকার মুসলমানদিগের মনের ভাবও তাই-ই। তাহারা মনে করে আমরা এক-কালে বাদশার জাত ছিলাম সেই গুমরেই এখনই হিন্দুদের প্রতি কুব্যবহার করিতেছে। বরকন্দাজদের সন্দেশের ওড়া খোঁজাও ঠিক বরকন্দাজদের মতই হইয়াছে। ঠিক যেখানে খোঁজা উচিত সেইখানেই খোঁজেনি। শিবাজীর কপাল!

বাকি বইটা Grant Duffএর মহারাষ্ট্র ইতিহাসের ছায়া লইয়া পদ্যে লেখা। তার ভিতরে বেশী দুইটি জিনিষ আছে (১) দেশ ভক্তির "হিরোয়িক্ ডোজ", বেশ মিষ্টি লাগে এবং মনকেও একটু মাতাতে পারে। (২) শিবাজীর স্ত্রীর চরিত্রটি বেশ ফোটে নাই। তিনি স্বামীকে তিরস্কার করিয়া সাজাহানকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন। তোমার দাদার বইয়ে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন মাত্র। পত্রলেখার মতলবটা যেন শিবাজীর নিজের।

মরাঠাদের নামগুলো ইংরাজি থেকে নেওয়ায় সব উল্টে পাল্টে গেছে। নাটকের নায়ক শিবজী নহেন শিবাজী। শিবাদেবীর আশীর্বাদে তাহার জন্ম হয়। দাদাজীকুন্দেব নামটা নাম নহে। নামটা দাদাজী কোণ্ডদেব। এইরূপ অনেক গুলি আছে।

অভিনয়ের পক্ষে বইখানি একটু বড় হইয়াছে। তোমার দাদা সেটি বেশ বুঝিয়াছেন। তাই তিনি মাঝে মাঝে "ব্রাকেট্" মারিয়া ফুট নোট লিখিয়াছেন "অভিনয়ে এ অংশ বাদ দিতে হইবে।" আমার বোধ হয়

আরও ছোট করিলে ভাল হইত। এক জায়গায় আবজাল খাঁর ব্যাপারে পাঠান লিখিতে মোগল লিখিয়াছেন। বুঝিতে আমাকে বেশ কষ্ট পাইতে হইয়াছে। ওটা ছাপাখানার দোষ হইতে পারে।

বইখানির যা উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। শিবাজী ও রামদাসের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। রামদাসের মতন গুরুই গুরু, ঠিক বিপদের সময় আসিয়া হাজির। আর শিষ্যের অমনিই প্রাণে বল সঞ্চার। নিরক্ষর শিবাজী যথার্থ হিন্দু। হিন্দুর যত গুণ থাকা দরকার সবই তাঁহার ছিল। যিনি একটা প্রকাণ্ড রাজ্য গুরুকে দান করিতে পারেন তিনিই বড় বড় রাজত্ব স্থাপন করিবার ঠিক উপযুক্ত। দিলীপ বশিষ্ঠের এক কথায় প্রকাণ্ড রাজত্ব ছাড়িয়া গরুর রাখাল হইতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি রঘু-বংশের মত একটা প্রকাণ্ড বংশ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

18-7-27

I send this pencil draft to you for your perusal. When will you come and undertake invitations and read Sakuntala. How did you like that days performance. Amrita Lal Bose liked my story of Bhima's eating Jackfruit in Magha and he has asked me to send one and I am doing so to-day.

Yours
H. S.

পত্রসংখ্যা ১৩

26, Pataldanga Street,
Calcutta, January. 1, 1928.

কল্যাণবরেষু,

আজ ইংরাজী বৎসরের প্রথমদিন ভোরে উঠিয়া তোমায় পত্র লিখিতে বসিয়াছি। বৎসরের প্রথম আশীর্ব্বাদ করি তুমি যেন দীর্ঘজীবী হইয়া ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ কর [পুত্রে বড় নয় বোধ হয় কন্যায়] তোমার পত্র

পাইয়াই যদি জবাব লিখিতাম এ আশীর্ব্বাদটা হতো না আর একটা কাজ হোত না। সেটা একটা মস্ত খবর। আমার ৫ বছরের খাটা খাটনি সব সার্থক হয়েছে। পুরাণের ডেট পেয়েছি ২ শত শতাব্দী খৃষ্টের পূর্ব্বে। ব্রহ্ম পুরাণ তাই। আর ব্রহ্মপুরাণ হোল আদি পুরাণ সুতরাং বাকী পুরাণ পরে পরে হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায় এবং হইতেছেও তাই পরে পরেই হইতেছে।

তুমি নাই আমার কোনও কাজ হইতেছে না। করপোরেশনে দরখাস্ত করি নাই তুমি আসিলে করিব। সায়েন্স কংগ্রেস লইয়া আবার সাহিত্য পরিষদে চাঁদা হইতেছে। আরো কিছু ঘাইই ফুট্ফাট্ হইবে। সদাশিব মিশ্র মহাশয় পত্র লিখিয়াছেন। মুক্তিমণ্ডপের বই যাতে হয় সে চেষ্টায় আছি। বাবা জগন্নাথ যেন আমাদের মঙ্গল করেন। ভ্যানমানেনকেও তাই বলিয়াছি তাহার জবাবের নকল মিশ্র মহাশয়কে পাঠাইয়াছি।

এখানে বড় একঘেয়ে সময়ও কাটে না কাজও হয় না আগায় না। বাড়ীও যাইতে পারি না কোথাও যাইতে পারি না কাহারও সঙ্গে দেখাও করিতে পারি না।

তোমার আসার আর কদিন দেরী আছে। সদাশিব মিশ্র মহাশয়কে আমার নমস্কার জানাইয়া দিও। আমরা ভাল আছি বলিও।

শুভাশী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ১৪ Calcutta, January 10, 1928.

My dear Ganapati Babu,

Babu Hemkanta Ganguli says that there are two permanent vacancies in the School within the corporation (1) in Chatterjee's Lane at Mirzapore (2) Kalighat Model School. Hem Kanta has passed the

Matric in 1922 in the first Division and read up to the Intermediate. The Officiating educational officer is likely to fill up the vacancies very soon.

Kindly tell your Mejda to take an interest in the poor man Hemkanta and get him one of the places. I will be always prepared to write to any one great man you advice me.

Yours Sincerely,
Haraprasad Shastri.

পত্র সংখ্যা ১৫—ইহা ৪৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে ... (14, Feb., 1928.)

পত্রসংখ্যা ১৬ Calcutta, June, 11, 1928.

কল্যাণবরেষু,

গণপতিবাবু, আমি গত শুক্রবার রাত্রে দশটার সময় খানাকুল হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছি। ফিরিয়া দেখি ফরওয়ার্ড আপীস হইতে পত্র আসিয়াছে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর বাৎসরিক ঐ দিন আমায় কিছু লিখিতে হইবে। তাই আমি তোমার নারায়ণের ফাইলটা দেখিতে চাই। পাঠাইয়া দিবে কি? যদি না দিতে চাও আমিই গিয়া দেখিয়া আসিব।

আমি আজ বাড়ী যাইব। কেননা বিনয় দেশে আসিয়াছে। আমি পরশু সকালে আসিব। আসিয়া যেন তোমার উত্তর পাই।

শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ১৭—ইহা ৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।.........9-4-1929

পত্রসংখ্যা ১৮ Post Card। শ্রীশ্রীদুর্গা সহায় ২৬ পটলডাঙ্গা ৩১।১।৩০

কল্যাণবরেষু,

অনেক দিন আইস নাই। আমি কাল বাড়ী যাইব। তোমার আর

কি কি কাজ আমার কাছে আছে বলিও। আসিয়া পারিত করিয়া দিব ও অনেক খবর নিব। আমার নূতন খবর কিছুই নাই। পুরান খবরের মাঝে সামনের ঘরটা করবার সাংসন আজও পাই নাই। আর টেকস বাড়ানর বিরুদ্ধে দরখাস্ত দুখানার কোন সংবাদ পাই নাই। পা যেমন ছিল তেমনিই আছে। তবে দেহটা ভাল।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ১৯

Mahamohopadhyaya
Dr. Haraprasad Shastri, M.A., C.I.E.
Honorary Member, R.A.S. of London.

26, Pataldanga Street,
Calcutta, April, 31, 1931.

কল্যাণবরেষু,

গণপতিবাবু, তোমার দাদার সইওয়ালা তোমার মেয়ের বিবাহের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। একে তোমার মেয়ে আবার ৺ক্ষুদিরাম বসুর ছেলে দুই আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র। দুজনের মিলনে মণিকাঞ্চন যোগ হউক এই আমি ৺স্থানে নিরন্তর প্রার্থনা করিতেছি। ১৮৭৪ সালে সুদূর রাঢ়ে এক দুর্গম জায়গায় ক্ষুদিরামবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তাহার পর আমাদের এ পর্য্যন্ত বরাবর প্রীতি ছিল। প্রীতি খুব ঘন হউক আর না হউক পরোক্ষে উভয়েই উভয়ের হিত আকাঙ্ক্ষা করিতাম, তাহার পুত্রটি দীর্ঘজীবী হউক আর তোমার মেয়েটি এয়োত্ বাড়ুক ও হাতের নোয়া ক্ষয় হইয়া যাউক। আমি যাইতে পারিলাম না, তাহাতে দুঃখ নাই মনটা বিবাহের ক্ষেত্রেই ওদিন পড়িয়া থাকিবে।

শুভার্থী,

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ২০—Post Card শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়ঃ

২৬, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট

৭.৫।৩১

কল্যাণবরেষু,

গণপতিবাবু তোমার মেয়ের বিয়ে ত হইয়াছে ১৮ তারিখ আজ ৭ দিন। তুমি বোধ হয় একটু অবসর পাইয়াছ। আমার একটা কাজ করিয়া দাও না ভাই। বড় উপকার হয়।

আগামী ২৮শে জ্যৈষ্ঠ দেবীর বিবাহ হইবে তাহার মা ও ঠাকুরদাদা স্থির করিয়াছে, ঐ দিনটা কেমন যদি একবার পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিতে পার আমার বড় উপকার হয়।

আমি রোজই মনে করি তুমি আসিবে। আজ আর সে অপেক্ষা না করিয়া পোষ্টকার্ড লিখিতেছি। বিবাহ বোধ হয় নির্ব্বিঘ্নেটে মিটিয়াছে।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ২১ Calcutta, May, 12, 1931.

কল্যাণবরেষু,

গণপতিবাবু এতদিনে তোমার মেয়ের বিবাহের সব কাজ বোধ হয় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন যদি একবার আমার এখানে আসিতে পার বড় উপকার হয়। ভুবন আসিয়াছে, তাহার মেয়ের বিবাহ। সে তোমার কাছে কতকগুলি পরামর্শ ও সন্ধান চায়। সে কিন্তু আজ রাত্রে দেরাদুন এক্সপ্রেসে যাইবে। দুদিনের মাত্র ছুটি আনিয়াছিল কাল সকালে তাহাকে হাজারীবাগে জইন করিতে হইবে। তাহার মেয়ের বিবাহের দিন ৩০শে মে স্থির হইয়াছে। সে ১৫ দিনের ছুটি লইয়া ২৪শে মে এখানে আসিবে।

আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কাল তুমি আসিবে।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পত্রসংখ্যা ২২ Calcutta, 13-5-31

কল্যাণবরেষু :--

গণপতিবাবু, আপনার পত্র পাইলাম। আপনি রসিকলাল মুখোপাধ্যায়ের যে ঠিকানা দিয়েছেন, ও বামুনের যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ। তাঁহারা আসিলেই আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিব—কবে আসিতে হইবে ও কি করিতে হইবে।

আপনাকে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ নামে যে বই দিব বলিয়াছিলাম, তাহা আমি পূর্ব্বেই নৈহাটী পাঠাইয়া দিয়াছি। আমার এখানে যাহা আছে, সে ব্রজেন্দ্রবাবুর লেখা—গবর্নমেণ্টের রেকর্ড হইতে লইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন চরিতের ফর্ম্মাগুলি। উহাতে আমার লেখা ভূমিকা নাই। সুতরাং উহাতে আপনার তৃপ্তি হইবে না। এইজন্য পাঠাইলাম না। কাল কুমার সাহেব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শাস্ত্রীমহাশয়ের পত্রগুলির অবিকল নকল ছাপান হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সম্পর্কে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্র :—

(1) Sept. 5, 1929

কল্যাণবরেষু,

জ্যোতিষ বাবু, এবার একটু জোরে চেষ্টা করিতে হইবে। সেপ্টেম্বরে ত হইল না। অক্টোবরের প্রথম হইতে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে

জানুয়ারীর ব্যজটে যায়। মল্লিক মহাশয় আসিয়াছেন কি? তাঁহার দ্বারা যতদূর হয় চেষ্টা করিতে হইবে। আপনার যে দিন সুবিধা এদিকে যদি আসিতে পারেন বড় ভাল হয়। পরামর্শ করিয়া সকলে এক সঙ্গে কাজ করা যায়।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদশাস্ত্রী।

(2)

Mahamohopadhyaya, 26, Pataldanga, St.
Dr. Haraprasad Shastri, M.A.,C,I,E. Calcutta.
Hony. Member R. A. S. of London. মার্চ্চ, ১, ১৯৩০

কল্যাণবরেষু,

জ্যোতিষবাবু, সাহিত্য পরিষদ্ লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছি। যতীন বাবু ত দিল্লীতে আছেন। এদিকে করপোরেশনের গ্রাণ্ট এবারে পাকা হবার কথা কিন্তু তাহার কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। মিনষ্টার সেদিন আসিয়া আমায় ও আপনাদের সকলকে বলিয়া গিয়াছেন যে ২।৫।১০ মিনিটে সাহিত্য পরিষদ্ দেখা যায় না। একদিন ২।৩ ঘণ্টা দেখিতে হইবে। তাঁহাকে ও আর পাঁচজন লোক লইয়া একটী টী পার্টি এই সময় করা দরকার। অর্থাৎ লেজিস্লেটিভ কাউনসিল মীট্ করিবার পুর্ব্বেই পার্টিটী করা দরকার। কাকেই বা বলি কেই বা করে। আমি পা খোঁড়া হইয়া বসিয়া আছি। এখন আপনি আসিয়া যাহা একটা করুন। না হলে অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িতেছে।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

[এই প্রথম পত্রটি গবর্ণমেণ্টের গ্রাণ্ট এবং শেষখানিতে গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেসন উভয় গ্রাণ্ট সম্পর্কীয়।]

মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ১৮৯৭ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের নেপাল-ভ্রমণের একমাত্র সহচর ছিলেন। তাঁহার "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভের অব্যবহিত পরে ভাটপাড়ায় তাঁহার অভিনন্দন-সভা হয়। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা এবং ঐ পত্রের পৃষ্ঠে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

ভাটপাড়া
২৮শে আষাঢ়

অশেষ শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক মমাবেদনমেতৎ

মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় !

আমি আপনার কৃপাপূর্ণ স্নেহ পাইয়া থাকি ও সেই সূত্রেই এই অভাবনীয় সম্মানলাভের পাত্র হইয়াছি। এই ধ্রুব সত্যটী সাধারণেরও হৃদয়গম্য হইয়াছে। সুতরাং আমি আপনার—তাই আজি সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা আপনি ঐ ২রা শ্রাবণ রবিবার এই সভায় উপস্থিত থাকিবেন। আমার প্রতি এই কৃপা করিলে আমি কৃতার্থ হইব; কমলের এই প্রার্থনা অসঙ্গত নহে। আপনি কৃপা করিয়া এই প্রার্থনা পূরণ করিবেন। গ্রামের তাবৎ ব্যক্তিই আপনার আগমন সম্ভাবনা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ইতি।

ভবদীয় চিরানুগৃহীত
শ্রীকমলকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ

এই পত্রের পৃষ্ঠে শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন,—

কমল, তোমার অভ্যর্থনা সমিতিতে আমার যাইবার যো নাই। কেন না, কাল হইতে ৫।৭ দিন রোজ সংস্কৃত কলেজ কমিটির মীটিং হইবে এবং

বৈকালেই হইবে। আমি ত যাইতে পরিলাম না কিন্তু আমার মন ঐখানেই পড়িয়া রহিল জানিবে।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পরিশিষ্ট (খ)

From the Record of the Asiatic Society of Bengal.

MEMORANDUM :—

M. M. Haraprasad Shastri's Allowance.

Since 1909 M. M. Haraprasad Shastri has been in receipt of an allowance of Rs. 300/-. Of this Rs. 100/- was debited under the head Salary of Officer in charge of Bureau of Information, and Rs. 200/- under the head Sanskrit Mss. Fund.

The Shastri was proposed as President in 1918 and elected in February, 1919. It was thought desirable that a President should not be in receipt of emoluments from the Society.

The Shastri waived his claims to a remuneration during his term of Presidency which lasted during 1919 and 1920.

In 1921 he has appoined a Professor in the Dacca University and he again waived any claim to receipt of the old allowance (his letters of 17th May and 7th June, 1921) till the termination of his appointment, end June 1924. He offered to continue his work on the Catalogue gratuitously and to let the Government grants accrue during this period to be utilised for expenditure on printing.

পরিশিষ্ট (গ)

গণপতিবাবু—

এইটা আপনার দাদার বইএর।

শ্রীহর

১৬।৫।২৮

শুনিয়াছিলাম দ্বাপরের শেষে ধরণী বড় উৎপীড়িত হইয়া ভূভার হরণের জন্য নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। নারায়ণও কুরুকুল ও যদুকুল ধ্বংস করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছিলেন। কলির পাঁচ হাজার বছরের পর আবার দেখিলাম ধরা আবার নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন কিন্তু এবার দেখিলাম তিনি একা নন সঙ্গী আছেন ধর্ম্ম। না থাকিলেও হইত। এবার কিন্তু কোন কুলই ধ্বংস হইল না। আস্তে আস্তে কাজ মিটিয়া গেল। কিন্তু দুই জায়গায়ই ভূভার হরণের হাতিয়ার একই 'কর্ম্ম'। এবারকার বইখানির নামই "কর্ম্মরহস্য"। নামটা খুব চক্‌চকে রগ্‌রগে হয় নাই। এ নামে বই যে বিকাইবে বোধ হয় না।

উজ্জয়িনীর রাজা বিজয়নগর জয় করিয়াছেন। দেশের লোক স্বায়ত্ত-শাসন চায়। রাজা দিতে চান। চান না মন্ত্রীরা। তাঁরা চায় বিজয়-নগরের প্রজারা উজ্জয়িনীর প্রজাদের অধীন হইয়া থাকে আর উজ্জয়িনীর প্রজারা বিজয়নগরের প্রজাদের শোষণ করে। মন্ত্রীদের মতেই কাজ চলে। রাজা তাহাদের এক একবার ধমক দেন মাত্র আর কিছুই করেন না।

বিজয়নগরের প্রজারা দল পাকাইতে লাগিল। আর্য্য ও অনার্য্য দুই সঙ্ঘ হইল। দুই সঙ্ঘে প্যাক্ট হইল। অনার্য্যেরা প্যাক্টের ক্ষীরটুকু খায়। কাজটুকু করে না। প্রজাদের কোনও উপকার হয় না। অত্যাচার নিবারণ হয় না। শেষ জাতীয় সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। এক এক করিয়া সব রকমের লোকই জাতীয় সংঘে যোগ দিল। মন্ত্রীরা আর্য্য অনার্য্য ছাড়িয়া জাতীয়সংঘের মূল আসামীদের জেল দিলেন। কিন্তু কিছুতেই

কিছু হইল না। সকলে জেলখালাস হইলে দেখা গেল যে জাতীয় সংঘ এতই প্রবল হইয়াছে যে আর স্বায়ত্তশাসন না দিলে চলে না। রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন স্বায়ত্তশাসন দেওয়া গেল। সব চুকিয়া গেল। আবার ধরা আসিলেন ধর্ম্ম আসিলেন রাধা আসিলেন কৃষ্ণ আসিলেন পৃথিবীটা বৈকুণ্ঠ হইয়া গেল।

কর্ম্মরহস্য নাটকের এই ত আখ্যায়িকা। এটা এক রকম স্বরাজপার্টির জয়গান। কিন্তু স্বরাজপার্টির এই জয় হবে কি? স্বরাজপার্টি যত ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কিষণচাঁদ বর্ম্মার উকিলী ত্যাগ ও জাতীয় সঙ্ঘের সভাপতি হওয়াই প্রধান। সেটি নাটকে বেশ ফুটিয়াছে। পড়িলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথা স্বতই মনে পড়ে। দেশবন্ধুর ত্যাগ বাঙ্গালীর একটা মহাগৌরবের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই আখ্যায়িকার ভিতর নাটকে সমাজ সংস্কারের নানারূপ চিত্র দেওয়া হইয়াছে। তার মধ্যে অভ্রান্ত মিশ্রের স্ত্রীস্বাধীনতা দান ও তাহার স্ত্রীর ভয়ানক বেয়াদবী ঘরে ঘরে পড়া উচিত। শুধু বাঙ্গালায় নয় সকল দেশেই ঘরে ঘরে পড়া উচিত। নাটককার বাঙ্গালীর স্ত্রীচরিত্রগুলি যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে তিনি যে প্রাচীন প্রথার একান্ত পক্ষপাতী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অভ্রান্ত মিশ্র বড় মানুষ লোক। তিনি নাম পাইবার জন্য রাজসম্মান লাভের জন্য স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নামও হইল রাজসম্মানও হইল। কিন্তু তিনি যখন সাধারণ উদ্যানে বসিয়া বিদ্যাদিগ্‌গজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তখন একজন চৌকিদার আসিয়া বলিল "দেশী আদমিকো হিয়া বৈঠনেকে হুকুম নেহি হ্যায়"। তিনি বলিলেন "লোক চিনে কথা বল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, সেখানকার সভ্য, আইন পরিষদের সরকার মনোনীত সভ্য, রাজপ্রতিনিধিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু।" চৌকিদার গালি দিয়া বলিল "তু মেরা সার্ হ্যায়। জলদি হিয়াসে

ভাগ্। ফিন্ বাত বোলেগা বেকুব! তব জবরদস্তিসে ভাগায়েগা।" ইহার পর রুলের গুতও হইল। হাত বাঁধাও পড়িল। শেষে উদাসীন আসিয়া চৌকিদারকে বলিল, সে ছাড়িয়া দিল। ছাড়িয়া দিবার সময় বলিল "উদাসীজীকো বাৎসে তুমকো ছোড় দেতা। লেকিন এস্তা কাম নেহি করনা।' মিশ্র মহাশয় দেখিলেন তাঁহার ধন, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার পদমর্য্যাদা কিছুতেই রাজার হুকুম রদ হইল না। তিনি যে এত বড় সমাজ-সংস্কারক তাহাতেও তাঁহার রক্ষা নাই। তাই তিনি আস্তে আস্তে উদাসীনের সঙ্গে গিয়া জাতীয় সভায় যোগ দিলেন এবং আপনার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি জাতীয় সভায় দান করিলেন। এমন মর্ম্মস্পর্শী চিত্র নাটকে অতি বিরল।

সুদখোর মহাজন ফতে সিং আগরওয়ালার চিত্রটিও বেশ। আপনার ছেলেটি তিনবার ফেল করে একটা পাশ করেছে তার বিয়েতে তিনি ১০,০০০৲ হাজারের এক কড়া কমে রাজী নন। কিন্তু বৃন্দে ঘটকী যখন চারটে পাশকরা ছেলে আনিল আর বলিল ৫০০০৲ টাকা দিতে হবে তখন আগরওয়ালা বলিয়া উঠিল 'ওরে বাবা পাঁচ হাজার টাকা শুনে যে আমার বুকে পিটে খিল লেগে গেল।' সুদখোরের শালা বসেছিল বল্লে "সনৎ পাশ করতে পারেনি বটে কিন্তু সে বোনাইএর চেয়েও কারবারে পটু হয়েছে। কত চারটে পাশআলা তার কাছে চাকরীর উমেদারী করবে। এই তোমাদেরই আপিসে তিন চারটি পাশআলা কত লোক ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনেতে কাজ করচে। পাশকরা ছেলেদের কথা আর বোল না দিদি। যারা বোঝে না তারাই পাশের গুমোর করে।" হায়রে পাশ!!! পাশের এমনিই দশা হয়েছে। কত যে পাশকরা ছেলে বসে আছে তার আর ঠিকানা নাই। পাড়াগাঁয়ে একটি ছেলে বি, এ পাশ করিলে সেকালে গ্রামে মহোৎসব পড়িয়া যাইত, এখন পাশ করিলেই অন্ধকার। একটি ছেলেকে এম্, এ; বি এল্ পাশ করাইতে এখন ১০।১২ হাজার টাকা খরচ হয় কিন্তু পরিণাম কি? কিছুই নয়। এখন অনেকেই বলিতেছেন

"যে বিদ্যা দিয়েছ মাগো, ফিরে কেন নাও না, কালী কলমের কড়ি ফিরে কেন দেওনা, দুদিন খেয়ে বাঁচি।"

নাটকে সকলের চেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে বিদূষক ও বিদ্যাদিগ্‌গজের মত লোক নামান। ইহারা প্রতিবাদ করে না। কাহারও মুখের উপর তোমার ভুল হচ্চে বলে না অথচ প্রতিকথার প্রতিবাদ হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকবার দেখিলাম "ফষ্টিনষ্টি" "বিদ্রূপ" "ব্যঙ্গ" ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। অথচ ইহার দুজনেই ভাল লোক। পরের দুঃখে কাতর। অন্যায় সহিতে পারে না। যথাসাধ্য লোকের উপকার করে। মিসেস্ অলকা যখন লম্বাই চওড়াই করিয়া শেষ দেখিল সব মিছা, সে বিদ্যাদিগ্‌গজের নিকট আশ্রয় পাইল। দিগ্‌গজনী তাহাকে মেয়ে বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। রামচাঁদবাবু যখন বেয়াদবি করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছেন, আর সতীস্বাধ্বী স্ত্রী আপনার সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া স্বামীকে ঋণমুক্ত করিয়াও স্বামীর সন্ধান পাইতেছেন না। তখন সে সন্ধান করিল কে? স্বামীস্ত্রীকে আবার মিলাইয়া দিল কে? সেই বিদ্যাদিগ্‌গজ।

গ্রন্থকারের আর এক কল্পনার সৃষ্টি উদাসীন। পৃথিবীতে যা কিছু ভাল সব উদাসীনে আছে অথচ সে কেমন নির্ব্বিকার। মনে কোনরূপ দ্বিধা নাই। কেবল বিপন্নের ত্রাণ করিতেছে। আর লোকজন লইয়া গিয়া জাতীয় সঙ্ঘে মিলাইয়া দিতেছে।

অনন্ত দেবের কথা কিছু বলিব না। তিনি বোধ হয় মহাত্মা গান্ধী। বিধুবাবুর নাটকের এক গুণ, উহার স্রোত গঙ্গার স্রোতের মত গড়গড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বাধিতেছে না। কোন জায়গায় যে ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে হইতেছে বা কথা জোগাইতে হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও কাঁটা খোচা নাই। প্রতিভাশালী লোকের মত বিধুবাবু

লিখিয়া বড় একটা শোধন করিতে চাহেন না। করিলে প্রথম লাইনেই ছন্দঃপাত হইত না।

"অপার আনন্দময় আনন্দ নিকেতন" এখানে আনন্দের নিকেতন বলিলেই হইত। বিধুবাবু পাপকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়া রাণী সাজাইয়াছেন কি করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। সংস্কৃতেই বল আর বাঙ্গালাতেই বল পাপ যে নপুংসক।

বিধুবাবু লেখার অভ্যাস রাখিলে অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। "উঠন্তমূলা পত্রেই চেনা যায়।"

পরিশিষ্ট (খ)

৺শ্রীশ্রীহরি

শরণং

২৫।৪।৪৩
ঝিনাইদহ।

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষঃ

নৃত্যবাবু! বহুদিন আপনার কোন মঙ্গলাদি পাই নাই আশা করি গুরু কৃপায় শারীরিক মঙ্গলে আছেন। শ্রীযুক্ত ছোট বাবু আমার নিকট ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকা মহাশয়ের বংশপরিচয় এবং আদি নিবাস জানিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নানা কার্য্যবশতঃ তাহা সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, এইক্ষণে আমি যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম।

উঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস বাতপুষ্করিণি বা বঙ্গপুকুরিয়া ছিল তথা হইতে কামতা গ্রামে বাস করিতে থাকেন। তথা হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতামহ ৺মাণিক্য তর্কপঞ্চানন (১) দাঁতিয়া পরগণায় কুমরিয়া গ্রামে বাস

(১) মথুরেশ বাবু তর্কপঞ্চানন লিখিয়াছেন উহা তাঁহার ভুল, তর্কভূষণ হইবে।

করিতে থাকা সময় জানিতে পারেন ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করেন। মাণিক্য তর্কপঞ্চানন উক্ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে ইচ্ছা করিয়া নৈহাটী আসিয়া মিত্রবাবুদের সাহায্যে তাঁহাদের বাটীর নিকট একখানি ছোট বাটী ভাড়া লইয়া বাস করেন এবং প্রত্যহ নৌকাযোগে ত্রিবেণী যাইয়া সমস্ত দিন তর্ক-পঞ্চানন মহাশয়ের সহিত বিচার করিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিতেন, এই প্রকার কিছুদিন তর্কবিতর্কের পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন যে আপনার ন্যায় এরূপ বিখ্যাত পণ্ডিত ওরূপ গণ্ডগ্রামে বাস করা সঙ্গত নয়। আপনি নৈহাটীতে বাস করুন, তাঁহার পরামর্শানুসারে তদবধি নৈহাটীতে বাস করেন। * * * *

আপনারা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবেন। অলমতি বিস্তারেন।

আঃ— শ্রীমথুরেশ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[মথুরেশ বাবু একজন কবিরাজ। ইনি শাস্ত্রীর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সরকার নামক আমার এক আত্মীয়কে এই পত্র লিখেন। পত্র মধ্যে ছোটবাবু শব্দ আমার উদ্দেশ্যে লিখিত। এই পত্র পাইবার পূর্ব্বে এই পুস্তকের প্রথম ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য নৈহাটীতে শাস্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষের বসবাসের হেতু ইনি যেরূপ বলিয়াছেন তাহা পাদটীকায় তথায় দেওয়া হয় নাই। আমার লিখিত সংবাদের মূল শাস্ত্রীর পুত্র আশুবাবু; তিনিও মথুরেশ বাবুর প্রদত্ত সংবাদ জানেন না।]

শাস্ত্রীর—বাঙ্গালাগ্রন্থ ঃ—

১। ভারত মহিলা ২। বাল্মীকির জয় (১২৮৮) ৩। কালিদাসের ব্যাখ্যা—মেঘদূত (১৩০৯) ৪। কাঞ্চনমালা ৫। বেণের মেয়ে।

পাঠ্যপুস্তক ঃ—

১। প্রসাদ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ) ২। ভারতবর্ষের ইতিহাস।

অভিভাষণাদি ঃ—

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য ২। অখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলন (মথুরায়) সভাপতির অভিভাষণ ৩। কলিকাতার ভারতহিন্দুসভার মহাসম্মেলনে সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন।

সম্পাদিত বাঙ্গলাগ্রন্থ ঃ—

১। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (১৩১২) ২। বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলী ৩। বৌদ্ধগান দোহা (১৩২৩) ৪। মহাভারত—আদিপর্ব্ব (১৩৩৫)।

সম্পাদিত সংস্কৃত ও বৌদ্ধগ্রন্থ ঃ—

১। বৃহদ্ ধর্ম্মপুরাণ (১৮৮৮—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ) ২। বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ (১৮৯৪—১৯০০) ৩। আনন্দ ভট্টকৃত বল্লাল চরিত (১৯০৪) ৪। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (১৯১০) ৫। ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়ের পুথি (১৯১০)। ৬। অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ কাব্য (১৯১০) ৭। শৈনিক শাস্ত্র (১৯১০) ৮। আর্য্যাদেবের চতুঃশতিকা (১৯১৪)

সম্পাদিত মৈথিল গ্রন্থ ঃ—বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতা (১৩৩১)।

ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকা ঃ—

1. History of India 2. Vernacular Literature of Bengal before the introduction of English Education (1891). 3. Discovery of Living Buddhism in Bengal (1897). 4. Malavikagnimitra. (1907) 5. The Educative Influence of Sanskrit (1916). 6. The Study of Sanskrit. 7. Bird's eye view of Sanskrit Literature (1917). 8. Magadhan Literature (1923). 9. Lokayata (1925). 10. Absorption of the Vratyas (1926). 11. Sanskrit Culture in Modern India (Presidenctial Address of the 5th Oriental Conference in Lahore) (1928).

Reports and Catalogue :—

1. Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895—1900).
2. ” ” (1901-2 to 1905-6).
3. ” ” (1906-7 to 1910-11).
4. Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Darbar Library of Napal. V I & II (190

5. A Descriptive catalogue of Sanskrit Mss. the Govt. cellection in the Asiatic Society of Ben Vol.I. Buddhist Manuscripts (1917); Vol.II. Vedic Mss. (1923) ; Vol. III. Smriti Mss. (1925) ; Vol. IV. History and Geography (1923) ; Vol. V. Purana Mss. (1928) ; Vol. VI. Vyakarana Mss. (1931).

তাঁহার বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রবন্ধগুলির নাম ও যে পত্রিকা দিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এখানে আর দেওয়া হইল না। কারণ "হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা" ২য় ভাগ এবং The Indian Historical Quarterly Vol. IX. 1933 (Haraprasad Memorial Number) ত্রৈমাসিক পত্রে সেগুলি সুন্দরভাবে দেওয়া আছে।